KALIKATA LITTLE MAGAZINE LIBRARY-O-GABESHANA KENDRA
18/M TAMER LANE, KOLKATA-700009

Record No. : KLMLGK 2007/	Place of Publication : ৩নং হেস্টিংস স্ট্রীট, কলকাতা
Collection : KLMLGK	Publisher : প্রমথ চৌধুরী
Title : সবুজ পত্র (Sabuj Patra)	Size : 7.5" x 6"
Vol. & Number : 4/1 4/2 4/3 4/4 4/5	Year of Publication : বৈশাখ ১৩২৮ জ্যৈষ্ঠ ১৩২৮ আষাঢ় ১৩২৮ শ্রাবণ ১৩২৮ ভাদ্র ১৩২৮ Condition : Brittle / Good ✓
Editor : প্রমথ চৌধুরী	Remarks :

C.D. Roll No. : KLMLGK

মুখরক্ষা।

—:০:—

ভয়ঙ্কর গোলমাল! সন্ধ্যের পর থেকেই সদর দরজার উপর থেকে সানাইয়ের চীৎকার এবং এঁটোপাতা নিয়ে কুকুরদের মধ্যে ঝগড়া সুরু হয়েছে। চণ্ডীমণ্ডপে গুটীকয়েক ভট্‌চাজ্জি নস্যি নাকে টিপে শাস্ত্রের কচ্‌কচানি জুড়ে দিয়েছেন, এবং বাড়ীর মধ্যে মেয়েরা কুট্‌নো কোটা এবং ছেলেদের দুটো খাইয়ে দেবার তালে হুলুস্থুল বাধিয়ে দিয়েছেন।

বাড়ীর পাশের পোড়ো জমির মেরাপের নীচে একদল বরযাত্রী এসে জড় হয়েছেন যাঁদের তুমুল আনন্দের স্রোত থেকে থেকে অন্য সব শব্দকেই ভাসিয়ে কিম্বা ডুবিয়ে দিচ্ছে।

পাড়ার ভদ্রলোকদের মধ্যে আর বড় কেউ ব্রজেন বাবুর বাড়ীতে আসেন নি, কেবল এসেছেন মুখুজ্জে ও গাঙ্গুলি যাঁরা দুজনেই নিঃসন্তান এবং এই কাজের এবং পাড়ার সকল কাজেরই প্রধান উদ্যোগী। আর এসে জুটেছেন সেই ঘটকচূড়ামণি, যিনি এই সংঘটনের কর্ত্তা, এবং সেই পরামাণিক যে ব্রজেন্দ্র বাবুর বদান্যতার গুণে সব পরিত্যাগ কর্‌তে প্রস্তুত। বলা বাহুল্য ভট্‌চাজ্জিরা কেউই স্থানীয় নন, সুতরাং বিদায়ের পরিবর্ত্তে অন্য কোন দায়ের আশঙ্কা তাঁদের ছিল না।

স্ত্রীলোকদের মধ্যে অনেকেই গ্রামস্থ, কিন্তু তাঁদের আসাযাওয়া নাকি সামাজিক হিসাবে ততটা ধর্ত্তব্য নয়, এবং তাঁরা "আসেন নি"

একথা বল্লে পুরুষদের সেটা প্রমাণ করা বড়ই কঠিন, তাই তাঁদের সংখ্যা সম্ভাবনাকেও ছাড়িয়ে গিয়েছিল। মোটের উপর গোলমাল ও সংঘর্ষ যদি উৎসবের মানদণ্ড হয় তাহলে এ বিবাহে উৎসবের মাত্রা কিছুই কম হয় নি।

দেখতে দেখতে গ্রামের কতকগুলো ইয়ার ছোক্‌রা এসে বরযাত্রদের ছেঁকে বেঁকে ধরলে, এবং অবিলম্বেই ঘোরতর বাক্‌বিতণ্ডা ও শান্তিভঙ্গের সূত্রপাত হলো; কিন্তু কে কার খোঁজ রাখে।

একা ব্রজেন বাবু নিজের সাধ্যমত চারপাশে ছুটোছুটি করে বেড়াচ্ছেন, কাউকে মিষ্টি কথায় শান্ত করে, কাউকে ভদ্র-কথায় আপ্যায়িত করে, কারুর কাছে বা নির্ব্বাক হয়ে হাত জোড় করে।

বরপাত্র তখনো এসে উপস্থিত হন নি, তাঁর নিহাৎ অন্তরঙ্গ বন্ধুদের সঙ্গে তিনি এখনি আস্‌বেন এই রকম সকলের মুখেই দুই তিন ঘণ্টা ধরে শোনা যাচ্ছে। কিন্তু এগারোটার লগ্ন ত প্রায় উত্তীর্ণ হয়ে যায়।

তখন আকাশে মেঘ বেশ ঘনিয়ে এসেছে। ঠাণ্ডা বাতাসের দুই একটা দম্‌কা কখনো বা দুই একটা ঝাড়ের আলো নিবিয়ে দিচ্ছে, কখনো বা আঁস্তাকুড়ের জঞ্জালগুলোকে তুলে নিয়ে ঘুরোতে ঘুরোতে বিয়ের আসরে এনে উপস্থিত কচ্ছে, আর একটা হাড়ীর মেয়ের প্রাণান্ত হয়ে যাচ্ছে বকুনি খেয়ে ও সেইগুলোকে পরিষ্কার করে'।

ব্রজেন বাবুর মনটা যেন ক্রমশই কেমন একটু চঞ্চল ও উদ্বিগ্ন হয়ে উঠ্‌ছে। একে দেখবার লোকের অভাব, তাতে আকাশের বেগতিক, তাতে পাত্রের অনুপস্থিতি, এই তিন কারণে এবং সম্ভবতঃ আরো

অনেক কারণে, যা আমরা জানি না, তাঁর মনের ভিতরকার সমস্ত আয়োজন ও বন্দোবস্তও কে যেন গুলিয়ে দিচ্ছিল। তিনি বাইরে ছুটে গিয়ে একবার ঘড়ির দিকে ভ্রুকুটীর সঙ্গে চেয়ে বল্লেন "তাই ত"। তারপর গাঙ্গুলির কাঁধে হাত দিয়ে তাকে একটু দূরে টেনে নিয়ে গেলেন। গাঙ্গুলির কানে কানে কি যেন ফিস্ ফিস্ করে বলবার পর গাঙ্গুলি একটু বিরক্তির স্বরে বলে উঠ্‌লো, "অত অধৈর্য্য হলে চল্‌বে কেন।"

গাঙ্গুলির কথা শুনে মুখুজ্জে একটা ডাবা হুঁকো টান্‌তে টান্‌তে তাঁদের কাছে এসে দাঁড়ালেন এবং ব্রজেন বাবুকে সহসা গম্ভীর হয়ে যেতে দেখে বল্লেন "তুমি কিচ্ছু ভেবনা ব্রজেন, আমরা যখন রইছি তখন কারুর সাধ্যি নেই যে তোমার কোন রকম অসুবিধে করে—আজই কি, দুদিন পরেই কি।"

আসল কথা, মুখুজ্জে এবং গাঙ্গুলির যে উৎসাহ সে কেবল কর্ম্মের উৎসাহ, তার ফল সম্বন্ধে তাঁদের মত গীতার সঙ্গে যতটা মেলে ব্রজেনের সঙ্গে ততটা নয়।

ঘটক পীতাম্বর তখন তর্কবাগীশের সঙ্গে স্মৃতিতীর্থের রাক্ষস ও গান্ধর্ব্ব বিবাহ নিয়ে যে তর্ক হচ্ছিল—তাই হাঁ করে' গিলে ফেলবার চেষ্টা করছিলেন, এমন সময় তাঁর কানে খট্ করে বাজলো মুখুজ্জের শেষ কথা। পাছে এই শেষ মুহূর্ত্তেও সব কেঁচে যায় এই আশঙ্কায় তিনি তাড়াতাড়ি খড়ম পায়ে দিয়ে এবং কাছাটীকে ধুলোয় লুটোতে লুটোতে একেবারে ব্রজেন বাবুর কাছে গিয়ে উপস্থিত হলেন এবং ঢোক গিল্‌তে গিল্‌তে ভাঙ্গা গলায় বল্লেন—"কেন, কিছু গোলযোগ হচ্ছে নাকি?"

ব্রজেন বাবু ধীর ভাবে "না" এই উত্তর দিয়ে নিকটস্থ সম্প্রদান-স্থলে উপস্থিত হলেন।

পুরোহিত রামধন ভট্টাচার্য্য তখন কুশাসনের উপর দুই হাত দিয়ে দুই জানুকে বেষ্টন করে অনেকটা ক্যাঙ্গারুর মত উপবিষ্ট ছিলেন এবং তাম্রকুণ্ডের উপরস্থ এমন কোন জিনিসের উপর বক্রদৃষ্টি নিক্ষেপ কর্‌ছিলেন যা ফুল চন্দন নয়।

ব্রজেন বাবুকে দেখেই তিনি দু' তিনটি তুড়ীর সাহায্যে নিজের আলস্য প্রকাশ কল্লেন এবং তাঁর দীর্ঘ চিক্কণ টিকিটীকে বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ ও তর্জ্জণীর মধ্যে পাকাতে পাকাতে বল্লেন "কদ্দূর ব্রজেন বাবু? এদিকে আমার ত সব প্রস্তুত"।

"দেখা যাক্" বলে ব্রজেন বাবু আকাশের দিকে চাইলেন। একটা বিদ্যুত বড় মাছের মত আকাশের গায়ে 'কড়াৎ' করে একটা ঘাই দিয়ে মেঘের রং আরো ঘুলিয়ে দিয়ে গেল।

গাঙ্গুলী, মুখুজ্জে ও ঘটক আস্তে আস্তে ব্রজেন বাবুর কাছে এসে দাঁড়ালেন এবং অধ্যাপকের দল সভাস্থ হলেন। স্মৃতিতীর্থ একটা কোন কথা-প্রসঙ্গ তোল্‌বার ইচ্ছায় বল্লেন—"এ মেঘে বৃষ্টি হবে না—যদিও আড়ম্বর নিতান্ত কম নয়"।

শিরোমণি তাতে সায় দিয়ে বল্লেন—"শরৎকালে সবই বহ্বারম্ভে লঘুক্রিয়া"—ব্রজেন বাবু চমকিত হয়ে শিরোমণির মুখের দিকে চাইলেন।

তর্কবাগীশ শিরোমণিকে তিরস্কারচ্ছলে বল্লেন—"ও কথা এখন অপ্রাসঙ্গিক, সম্প্রতি লক্ষ্য করা উচিত যাতে লগ্ন ভ্রষ্ট না হয়"।

পুরোহিত সশব্যস্তে উত্তর কল্লেন, "সে বিষয়ে আমি সতর্ক আছি; এখনো রাত্রি দ্বাদশ দণ্ডের অধিক হয় নি—সুতরাং অনুমান আরো অর্দ্ধঘণ্টা সময় আছে"।

"তা হলে আর ত দেরী করা যায় না" বলে' ব্রজেন বাবু নবীন ও বাঞ্ছাকে ডেকে বল্লেন "ওরে! লণ্ঠন নিয়ে মাঠের মধ্যে এগিয়ে দে, তাঁরা আস্‌ছেন কি না"।

মুখুজ্জে গাঙ্গুলির দিকে চেয়ে বল্লেন "এ উত্তম প্রস্তাবই করেছেন—দেখা দরকার"।

গাঙ্গুলি একটু ব্যস্ত-সমস্ত ভাব দেখিয়ে নবীনকে ডেকে বল্লেন—"আর তাঁদের দেখা পেলে বাঞ্ছাকে বলিস তাঁদের সঙ্গে করে নিয়ে আস্‌তে, আর তুই দৌড়ে এসে আমাদের খবর দিবি"।

স্মৃতিতীর্থ হেসে বল্লেন "এটা খুব প্রবীণ কথা, কারণ তাহলে সংবাদ পাবামাত্রই কার্য্যারম্ভ করা যাবে"। বেশ বোঝা যাচ্চে এই অনুষ্ঠানে যে কয়জনে যোগ দিয়েচেন, সখের যাত্রার দর্শকদের মত অভিনয় ব্যাপারে তাঁদের মন নির্লিপ্ত,—আর কিছু না হোক্ তাঁরা আশা করচেন যথেষ্ট সঙ্ বাহির হবে। এমন সময় বাইরের থেকে শব্দ উঠ্‌লো "ওহে ছোকরা, দেখ না আমাদের দক্ষিণ হস্তের কোন ব্যবস্থা হচ্ছে কি না—ক্ষিদে মাত্ হয়ে যে চোঁয়া ঢেঁা ছাড়্‌তে আরম্ভ কল্লে"।

ব্রজেন বাবু উৎকণ্ঠিত হয়ে গাঙ্গুলির দিকে চাইলেন। গাঙ্গুলি মুখুজ্জের দিকে অঙ্গুলি-সংকেত করে বল্লেন—"যাওনা হে, একটু থামিয়ে রাখ না—আমি যে এখান ছেড়ে যেতে পাচ্ছি নি"।

একজন রসুইকর ব্রাহ্মণ ছুটে এসে পীতাম্বর ঘটকের কানে কানে বল্লে "বাবু লুচি কি এখন ভাজা বন্ধ থাক্‌বে?"

গাঙ্গুলি ঘটককে সরিয়ে দিয়ে তার জায়গায় নিজে দাঁড়িয়ে বল্লেন—"কি ? হয়েছে কি ?"

ব্রজেন বাবু সব শুন্‌তে পেয়েছিলেন, তিনি বল্লেন "দু'চার খানা করে' ভাজগে"—

গাঙ্গুলি তাড়াতাড়ি বল্লেন—"না,—এক খানাও না—সকলে এসে গেলে, একেবারে পাতে বসিয়ে দিয়ে গরম গরম লুচি পাতে দেবো"।

এদিকে বাড়ীর ভিতর থেকে কে একটা ছেলে উচ্চৈঃস্বরে ককিয়ে কেঁদে উঠ্‌লো "মা খাঁদী আমার কাপড়ে পান্তোয়ার রস দিলে।" সঙ্গে সঙ্গে তীব্র-মধুর কণ্ঠে আওয়াজ হলো—"লক্ষ্মীছাড়া মেয়েটাকে ঘরে চাবি দিয়ে রেখে এলে হতো—যা, দূর হ' "—অমনি শোনা গেল একটা প্রকাণ্ড চপেটাঘাতের শব্দ, এবং দেখা গেল একটা ছোট মেয়ে কাঁদতে কাঁদতে এবং জামা ছিঁড়্‌তে ছিঁড়্‌তে বাইরে ছুটে বেরিয়ে এল এবং উঠোনের মাঝখানে চিৎপাত হয়ে শুয়ে অনন্ত আকাশের বুকে সজোরে লাথি ছুড়্‌তে লাগ্‌লো।

ব্রজেন বাবু তাড়াতাড়ি মেয়েটাকে কোলে তুলে নিয়ে ঠাণ্ডা করে বাড়ীর মধ্যে পাঠিয়ে দিলেন এবং গাঙ্গুলীর দিকে চেয়ে বল্লেন "দাদা একবার ভাঁড়ারে না গেলে ত হয় না,—সেখানে নাকি সব লুট হয়ে গেল"।

গাঙ্গুলি খুব মুরুব্বিয়ানা ভাবে বল্লেন "আচ্ছা সে আমি দেখ্‌ছি, তুমি কিছু ভেবো না—আর একলা আমি ক'দিকেই বা যাই"।

গাঙ্গুলি বাড়ীর ভিতর যেতে যেতে একটা চাকরকে দেখ্‌তে পেয়ে তর্জ্জন করে বলে উঠ্‌লেন "এই বেটা—কোথায় থাকিস্—এক কল্কে তামাক দে"—এই বলে রোয়াকের উপর বসে পড়্‌লেন।

তর্কবাগীশ ব্রজেন বাবুর সঙ্গে আলাপ করবার সুযোগ খুঁজছিলেন—তিনি আবার কথা পাড়্‌লেন—"যাই বল শিরোমণি ব্রজেন বাবুর এ কাজ সকলে হয়ত সমর্থন না করতে পারেন, কিন্তু ওঁর সৎসাহসকে প্রসংসা না করবেন এমন কেউই নেই"।

ব্রজেন বাবু তর্কবাগীশের দিকে একটু প্রখরভাবে দৃষ্টিপাত কল্লেন। শিরোমণি বল্লেন "আর এ কাজ ত শাস্ত্রসম্মত—শাস্ত্রে এরও ত একটা ব্যবস্থা আছে"।

পুরোহিত মহাশয় স্মৃতিতীর্থের কাছ থেকে একটু নস্যি নিয়ে ছিলেন—তার ফলে তিনি হাঁচ্‌তে হাঁচ্‌তে এবং গামছা দিয়ে নাক রগ্‌ড়াতে রগ্‌ড়াতে বল্লেন—"আঁছে না ? নৈলে বিদ্যাসাগর মশায় ত একটা মূর্খ ছিলেন না"।

ক্রমে স্মৃতিতীর্থ ও এ তর্কে যোগদান কল্লেন এবং পরাশর বড় কি মনু বড়, যুগধর্ম্ম মেনে চলা উচিত কি না, এবং "নষ্টে মৃতে"—প্রভৃতি নানাবিধ শব্দ ও বচনের প্রয়োগে সে স্থান একটা টোলের মতই প্রতীয়মান হতে লাগ্‌লো।

পীতাম্বর বাঁকা হাসিতে শাণ দিয়ে কেবল এইমাত্র বলে নিরস্ত হলেন "বিশেষতঃ এমন সুপাত্র পেলে সকল বয়সের বিধবাই দার-পরিগ্রহ করতে পারেন।"

ব্রজেন বাবু ঘটকের দিকে ভৎর্সনাপূর্ণ দৃষ্টিতে চেয়ে বল্লেন—"শুনে যাও।"

ঘটক চুপ করতে গিয়েও তার মুখ দিয়ে কেবল এই কথাটী বেরিয়ে গেল—"একেবারে কার্ত্তিক—কোন দোষ নেই।"

ব্রজেন বাবু আর সেখানে বেশীক্ষণ দাঁড়াতে পাল্লেন না ; একজন সানাইওয়ালা এসে বল্লে—"বাবু আমাদের কিছু খাবার মিলবে না ?"

ব্রজেন বাবু "ওরে—ও—হাঁ—চল—আমিই দিচ্ছি" বলে ভাঁড়ারের দিকে ছুট্‌লেন।

কিছুক্ষণ পরে পুরোহিত হেঁকে বল্লেন—"কিন্তু আর ত দেরী করা যায় না—লগ্ন ত এসে গিয়েছে বটেই, বোধ হয় আর কিছুক্ষণ পরেই উত্তীর্ণ হয়ে যাবে।"

ব্রজেন বাবু ভাঁড়ার থেকে সেই কথা শুন্‌তে পেয়ে ছুটে বাইরে এসে বল্লেন—"ঘড়িতে এখন ত বারটা বাজে—তিন মিনিট আছে।"

স্মৃতিতীর্থ তাড়াতাড়ি পাঁজি টেনে নিয়ে মুখের ভঙ্গীতে নানাবিধ তর্ক ও গণনার চিহ্ন প্রকাশ করে বল্লেন "তাহলে আর ঠিক ১৭ মিনিট আছে, এদিকে তিন ওদিকে চোদ্দ।"

ব্রজেন বাবু চেঁচিয়ে উঠলেন—"ওরে নব্‌নে, ওরে বাঞ্ছা"—তার পর মুখুজ্জেকে আস্‌তে দেখে বল্লেন "মুখুজ্জে পাত্র এসে গিয়েছে ত ?"

মুখুজ্জে কি বল্‌বেন বুঝতে না পেরে বল্লেন—"হাঁ, বোধ হয় এসে গিয়েছে—আমার যেন দূর থেকে সেই রকম মনে হলো।"

"আহা, দেখেই এস না" এই কথা ব্রজেন বাবু বল্‌তেই মুখুজ্জে বল্লেন "দেখে আর আসব কি—বাবাজীকে তুলেই নিয়ে আস্‌ছি"—তারপর তিনি বাইরের দিকে চলে গেলেন।

রামধন ব্রজেন বাবুর দিকে চেয়ে বল্লেন—"ব্রজেন বাবু—শুন্‌ছেন—মশায়—এই দিকে আস্থন—বসে যান—আপনার কাপড় ত ছাড়াই আছে—আর আপনিই ত সম্প্রদান করবেন ?"

ব্রজেন বাবু "এঁ্যা, আমি বস্‌ব ?—তা—আচ্ছা—দাঁড়ান—একটু আস্‌ছি"—বলে তাড়াতাড়ি বাড়ীর ভিতর ছুট্‌লেন।

"এখন আবার চল্লেন—শীগ্‌গীর আস্‌বেন কিন্তু" বলে' পুরোহিত ফুলটুল সাজিয়ে নিয়ে আচমন করে বস্‌লেন।

ব্রজেন বাবু হাঁপাতে হাঁপাতে বাড়ীর ভিতর ছুটে গিয়ে ডেকে বেড়াতে লাগ্‌লেন—"গিন্নী—কোথায় গো—গিন্নী"। কিন্তু গিন্নী তখন নিকটে ছিলেন না। ব্রজেন বাবু খুঁজতে গিয়ে বারবার অপরিচিত স্ত্রীলোকদের সুমুখে পড়ে গিয়ে নিজেকে লজ্জিত এবং বিপন্ন বোধ কর্‌তে লাগলেন।

আসল কথা, গিন্নী সেদিন তাঁর শোবার ঘরেই চুপ করে বসে-ছিলেন। আজ ক'দিন ধরে' চোখের জল পড়ে পড়ে তাঁর চোখদুটো শুক্‌নো কাগজের মত কড়কড়ে হয়ে গিয়েছে—কিন্তু তাহলেও তাঁর মুখখানা বড়ই ভার—হাসির লেশমাত্র নেই। তবু পাছে এক ফোঁটা জল কোন ভুলে, কোন সময় চোখ ফেটে বেরিয়ে পড়ে তাই তিনি কোন আমোদ প্রমোদে, কোন আদর সম্ভাষণে যোগদান করেন নি—কেন না কর্ত্তার কড়া হুকুম ছিল—"আগে যা করেছ করেছ, আজকের দিনে চোখের জল ফেলে অমঙ্গল করতে পারবে না।" পাড়ার দু'একজন বর্ষীয়সী মহিলা এসে তাঁকে প্রফুল্ল করে নিজেদের মধ্যে নিয়ে যাবার জন্যে চেষ্টা করেছিলেন কিন্তু তাতে কোন ফল হয় নি। পাড়ার কর্ত্রী বিশ্বেশ্বরী এসে এমন কি তাঁর হাতে ধরে বলেছিলেন "সুবদনীর আবার সীঁথেয় সিঁদুর, হাতে লোহা উঠ্‌বে—আর তুমি মা হয়ে তা দেখবে না"—

জয়ন্তী কিন্তু কেবল এই উত্তর দিয়েছিলেন "তোমরাও ত ওর

মার মত—তোমরা গেলেই হবে—যেদিন ওর সিঁদুর পুঁছে—নোঁয়া ভেঙ্গে—ওকে থান কাপড় পরিয়ে দিয়েছিলুম আমার চোখে আজও ঠিক্ তেমনি একটা দিন।"

ব্রজেন বাবু গিন্নীকে খুঁজছিলেন মেয়ে কোথায় তাই জানবার জন্যে—কিন্তু তিনি হটাৎ নিজেই সেই ঘরে ঢুকে পড়লেন! তখন তরুণীরা সকলে মিলে সুবদনীকে সাজাচ্ছিল—

তিনি ঝড়ের মত ঘরে ঢুকে পড়তেই সকলে "ওমা কে ও!" বলে ঘোম্‌টা টেনে এক কোণে সরে দাঁড়াল তারপর চিন্তে পেরে ভাবলে তিনি এখনই চলে যাবেন। কিন্তু ব্রজেন বাবু নিশ্চল দৃষ্টিতে মেয়ের দিকে চেয়ে রইলেন যেন সে গ্রীক্-পুরাণের সেই একটা পরী যার দিকে চাইলেই লোকে পাথর হয়ে যেত।

তখন মেয়ের পায়ে আলতা পরিয়ে, চুল বেঁধে তাকে রাঙ্গা সাড়ী পরিয়ে দেওয়া হয়েছে—কেবল কপালে চন্দনের ফুল কিছু বাকি আছে।"

মেয়ে বাপের দিকে একবার চেয়ে ঘাড় নীচু কল্লে—আর তোলবার শক্তি রইলো না—ব্রজেন বাবু দেখতে পেলেন না—সে চোখে তখন বিদ্যুৎ কি বৃষ্টি—কুয়াসা কি ঝড়।

অন্যান্য রমণীরা পাশ কাটিয়ে বাইরে বেরিয়ে গেলেন।

ব্রজেন বাবুর হটাৎ মনে পড়ে গেল কি জন্যে তিনি এসেছেন—কিন্তু কথা কোথায়! ভাষা কোথায়! তিনি কি সব ভুলে গিয়েছেন? তাঁর মাথায় কি আর মস্তিষ্ক এক বিন্দুও নেই? তাঁর বুকের ভিতর কি আর বায়ু চলাচল কর্‌ছে না? না তাঁর জিভ্ শুকিয়ে তালুর সঙ্গে এঁটে গিয়েছে? কিন্তু কথা বল্‌ছিল তাঁর চোখ—সেই চোখ বারবার

মনকে জিজ্ঞাসা করছিল—"কেমন, এই ভাল, না সেই ভাল? কোন্‌টা ভাল দেখাচ্ছে? কোন্‌টা দেখে তুমি চিরদিন সুখী থাক্‌বে?"

ব্রজেন বাবু তখনো দাঁড়িয়ে রইলেন দেখে সুবদনী আস্তে আস্তে ডাকলে—"বাবা"।

ব্রজেন বাবুর মুখের ভিতর থেকে কি যেন একটা মস্ত পাথর সরে গেল—তিনি কাঁপানো গলায় জিজ্ঞাসা কর্‌লেন—"মা, সব ঠিক্—এইবার, এখনো বল, ফিরব না এগোব—একটু পরে আর হাত থাক্‌বে না।"

মেয়ে সে সময় আর কি বল্‌বে—সে জানে তার মায়ের কি স্নেহ—বাপের কি মঙ্গলকামনা। সে জানে তাঁদের একজনের কি ইচ্ছা—আর একজনের কি সংকল্প। এর মধ্যে তার নিজের ক্ষুদ্র সত্ত্বাটুকু কোথায়? তাকে ছিঁড়ে ভাগ করে দিতে পারলে সে হয়ত দুজনকেই সন্তুষ্ট কর্‌তে পারত, কিন্তু তা সে পার্‌লে কৈ? তার নিজের মনকে যাচাই করে, বুদ্ধিকে স্থিরভাবে প্রশ্ন করে—তার স্বাভাবিক সংস্কারের সঙ্গে তাদের বোঝাপড়া করিয়ে দেবার সময় পেলে কৈ? সে কেবল দুই ঝড়ের মধ্যে দাঁড়িয়ে নিজে বিক্ষুব্ধ হয়ে চিন্তিত হয়ে, চূর্ণ হয়ে, মাটির মধ্যে মিশে গিয়েছে—স্বাধীনতার উপর ভর দিয়ে দাঁড়াবার অবসর পায় নি। সে অনেক ভেবে শেষে এই কথাটী বল্লে "বাবা, ভেবনা—ভগবান সকলের মুখরক্ষা কর্‌বেন।"

ব্রজেন বাবু কি বুঝলেন জানি না—দ্রুতবেগে বাইরে বেরিয়ে এলেন এবং একেবারে সম্প্রদাতার আসনের উপর বসে বল্লেন—"কৈ মুখুজ্জে কোথায়? পাত্রকে এখনো নিয়ে এল না?"

কিন্তু কোথায় মুখুজ্জে? নবীন বাঙ্গারও কোন সংবাদ নেই।

এমন সময় মুষলধারে বৃষ্টি নেবে এল—বরযাত্রিরা মেরাপের নীচে থেকে একেবারে হুড়্‌মুড়্‌ করে বেরিয়ে এবং অনেক জিনিস পত্র লণ্ডভণ্ড করে পূজার দালানে অর্থাৎ সম্প্রদানের স্থানে গিয়ে হাজির হল।

তাদের জিজ্ঞাসা করাতে তারা বল্লে "কৈ, না—স্বরূপচন্দ্র ত এখনো এসে পৌঁছয় নি—সে নৌকায় চড়্‌বে দেখে আমরা চলে এলুম।"

"বল কি!" বলে ব্রজেন বাবু লাফিয়ে দাঁড়িয়ে উঠলেন।

"ব্যস্ত হয়োনা" বলে গাঙ্গুলি তাকে টেনে ধরে বসালেন।

"কিন্তু আর যে লগ্ন নেই" বলে ব্রজেন বাবু গাঙ্গুলির দিকে ঘৃণাপূর্ণ কাতর কটাক্ষে চাইলেন—সে কটাক্ষে সম্মানের চিহ্ন ত ছিলই না বরং বিদ্রোহের ভাব ছিল।

অল্পভাষী, দ্বিধাপূর্ণ ব্রজেন্দ্রের ভিতর যে এতটা শক্তি ও তেজ প্রচ্ছন্ন ছিল—যাতে সে তাঁর সঙ্গেও কড়া ভাবে কথা বল্‌তে পারে—এটা গাঙ্গুলি আজ নূতন দেখলেন।

তিনি পূর্ব্বের মত একটা যা তা উত্তর দিতে আর সাহস কল্লেন না—"তাহলে যা ভাল হয় তাই কর" বলে দূরে সরে গেলেন।

ঠিক্ সেই সময় সেখানে উপস্থিত হল একটা বিকট বীভৎস মূর্ত্তি—অনেকটা প্রেতের মত; সর্ব্বাঙ্গে কাদামাখা—চক্ষু রক্তবর্ণ—লম্বা চুল দিয়ে ফোঁটা ফোঁটা জল গড়াচ্ছে।

ব্রজেন বাবু তার দিকে চেয়েই বল্লেন—"এ কে? কে তুমি?"

সে প্রথমটা চুপ করেই রইল—কোন উত্তর দিতে পাল্লে না—কিন্তু তার চোখ যেন কাকে খুঁজে বেড়াতে লাগল।

এমন সময় পরামাণিকচন্দ্র এসে তার মাথায় টোপর পরিয়ে দিলে এবং ঘটকরাজও ছুটে এসে বল্লেন "তাই ত এমন অবস্থা"। তারপর অন্দরের দিকে মুখ করে উঁচু গলায় বল্লেন "হুলু দাও—শাঁখ বাজাও।"

অমনি হুলুধ্বনি ও শঙ্খ বেজে উঠল। কিন্তু ব্রজেন বাবু আস্তে আস্তে উঠে ঘটককে জিজ্ঞাসা কল্লেন—"এই কি আমাদের জামাই?"

ঘটক দ্বিধাপূর্ণ ভাবে বল্লেন "তাই বলেই ত মনে হচ্ছে—তবে মুখে টুখে কাদা রয়েছে বলে—"

"কিন্তু আমার ত মনে বল্‌ছে না, এই আমার সুবদনীর বর" বলে' ব্রজেন বাবু অন্যদিকে মুখ ফেরালেন।

"সে সন্দেহ আমারই যখন ভাল করে যায় নি, তখন আপনার ত হতেই পারে—তবে কাদাটাদাগুলো ধুয়ে ফেল্লেই বুঝতে পারবেন" এই বলে ঘটক চাকরদের ডেকে বল্লেন "ওরে জল নিয়ে আয়"—তারপর আগন্তুকের হাত ধরে তাকে বল্লেন "বাবাজি এইদিকে এস—কাদার মধ্যে পড়ে গিয়েছিলে বুঝি? তা পথ যে পিছল—"

এইবার আগন্তুকের মুখে কথা ফুট্‌লো। সে সকলের মুখের দিকে সন্দিগ্ধভাবে চেয়ে চিবিয়ে চিবিয়ে জিজ্ঞাসা কল্লে "বর এয়েছে? হাঁ মশায় বর এয়েছে?"

ঘটক বল্লেন, "সে কি কথা বাবাজি, বর ত তুমিই!" সে জড়িতকণ্ঠে বল্লে, "সেই কথাই ত জিজ্ঞাসা করছি। এখনো কি তবে ডুবে মরে নি? ঝড়ে নৌকাটা গেল উল্টে, বরের গলার মালাটা গেল ভেসে, আর ঐ আবাগের বেটা বরটাই বাঁচল না কি?"

ঘটক বরের এই প্রলাপ-উক্তি চাপা দিয়ে বলে উঠলেন—"তাহলে কাজ আরম্ভ করা যাক্, সময় বয়ে যায়।"

পীতাম্বরের মুখ কৌতুকহাস্যে কুঞ্চিত হয়ে উঠল। ব্রজেন এতক্ষণ হতবুদ্ধি হয়ে চৌকির উপরে মাথায় হাত দিয়ে বসে ছিলেন, হঠাৎ লাফিয়ে দাঁড়িয়ে বলে উঠ্‌লেন, "মরেছে, মরেছে, বর মরেছে—চুকে গেছে।"

ঘটক বল্লেন, "কি বল্‌ছেন ব্রজেন বাবু; আপনার হল কি?" ব্রজেন বল্লেন, "আমার মুখরক্ষা হল, আমার মেয়ের কথাই খাট্‌ল। এই যদি আমার সুবদনীর বর হয় তা হলে বর মরেছে।"

বাড়ীর ভিতর একটা কান্নার রোল উঠে পড়ল। মুখুজ্জে বেগতিক বুঝে কি একটা হাঁড়ি নিয়ে খিড়কীর দরজা দিয়ে বেরিয়ে পড়লেন এবং স্মৃতিতীর্থ, তর্কবাগীশের কানে কানে বল্লেন—"ছানার পায়েস জিনিসটা শোনাই গিয়েছিল, দেখা আর হল না"।

পুরোহিত মহাশয় ব্রজেন বাবুর নিকটে এসে বল্লেন "তা হলে আজ আমি আসি—আপনি দুঃখিত হবেন না—সমস্তই দৈবাধীন কার্য্য—"শ্রেয়াংসি বহুবিঘ্নানি"—তবে আপনি বুদ্ধিমান, বিবেচক লোক—আপনাকে আর বেশী কি বল্‌ব—আমার আজ্‌কের পারিশ্রমিকটা—"

ওদিকে গাঙ্গুলি ও ঘটক দু'পাশ থেকে দু'জনে এসে ব্রজেন বাবুর পাশে দাঁড়ালেন।

গাঙ্গুলি তাঁর মুখখানাকে যথাসম্ভব লম্বা ও বিমর্ষ করে বল্লেন—"ভেবে অবিশ্যি কোন ফল নেই ব্রজেন—তবে ঈশ্বর যা করেন তা ভালর জন্যেই—আমার সন্ধানে খুব ভাল একটী পাত্র আছে এবং খুব সম্ভবতঃ সে রাজী হবে—আমি কালই গিয়ে—"

ব্রজেন বাবু বাধা দিয়ে বল্লেন—"আচ্ছা, সে পরে হবে'।

"না—না—সে পরে কেন—আমি কালই গিয়ে প্রস্তাব তুল্‌ব—তুমি কোন দুঃখ করোনা—এ পাত্রের সঙ্গে তার আকাশ পাতাল তফাৎ—তার কোন রকম নেশা কি বদ্‌খেয়াল নেই"।

"তা হলে এর ছিল"? বলে ব্রজেন বাবু এমন একটা ছোট হাসি হাস্‌লেন যা শুন্‌তে খুব বিকট এবং দেখ্‌তে অনেকটা মেঘলা দিনের রোদের মত।

ঘটক তাড়াতাড়ি বলে উঠ্‌লেন—"না, না সে রকম কিছু নয়—তবে একটু আধটু—আচ্ছা তা গাঙ্গুলি যার কথা বল্লেন তাকেই না হয় কাল গিয়ে দেখে আসা যাবে—ভালর চেয়েও ত ভাল থেকে থাকে"।

ব্রজেন বাবু ঘটকের দিকে চেয়ে আর একবার হেসে বল্লেন—"বটে! তা হলে ঈশ্বর না করুন এ পাত্রের ও যদি কিছু হয় তা হলে এর চেয়েও একটা ভাল পাওয়া যাবে?"

ব্রজেন বাবুর কথার ভাবে গাঙ্গুলি ঘটক সকলেই চুপ কর্‌লেন। বরযাত্রেরা এক এক করে সরে পড়্‌বার উপক্রম কর্‌তে লাগল।

ওদিকে এক এক করে কে যেন সব আলো নিবিয়ে দিয়েছে—আর সানাইয়ের সুরও কোন্ সময় বন্ধ হয়ে গেছে—দেখ্‌তে দেখ্‌তে সমস্ত বাড়ী নীরব নিঝুম হয়ে পড়লো।

ব্রজেন বাবু অনেক্ষণ গম্ভীরভাবে চুপ করে থেকে হটাৎ বলে উঠ্‌লেন—"ওরে কে আছিস্ সব আলো জ্বেলে দে—আর সানাই-ওয়ালাদের বল্ খুব কসে' বাজাতে"।

পুরোহিত আশ্চর্য্য হয়ে বলে উঠ্‌লেন—"সে কি!—"

ব্রজেন বাবু হাস্‌তে হাস্‌তে বরযাত্র, পুরোহিত এবং অন্যান্য ভদ্রলোকদের দিকে চেয়ে বল্লেন "আপনারা কেউ যাবেন না—খেতে বসুন —আমি নিজে পরিবেশন কচ্ছি।"

পুরোহিত আশ্চর্য্য হয়ে বল্লেন,—"সে কি ব্রজেন বাবু, লগ্ন ত আজ গেছে।"

ব্রজেন উত্তেজিত হয়ে বলে উঠ্‌লেন, "গেছে, গেছে, চিরদিনের মত গেছে, আর ভাবনা নেই।"

শ্রীসতীশচন্দ্র ঘটক।

সংস্কৃতের প্রভাব ও অনুবাদ সাহিত্য।

———:০:———

তত্ত্ববিদ্‌গণ সংস্কৃতকে দেবভাষা বলিয়া থাকেন। স্বর্গরাজ্যের নথিপত্র এই ভাষায় রাখা হইত কিনা বলিতে পারি না, তবে ভারতের ভূদেবেরা যে ইহার সৃষ্টি ও পুষ্টি করিয়াছিলেন, তাহা প্রায় সর্ব্ববাদিসম্মত। প্রায়টুকু বলিলাম, কেননা ইহার পূর্ণ দেবত্বের দাবিদারগণ বাদান্তরও পোষণ করিতে পারেন। স্রষ্টার বিশেষ বিশেষ অঙ্গ হইতে বিশেষ বিশেষ জাতির উৎপত্তিতে যাঁহারা সম্যক বিশ্বাসবান্, বৈজ্ঞানিক বা আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা যাঁহাদের নিকট অতি দুর্ব্বোধ্য সুতরাং অকিঞ্চিৎকর, বিচার তর্ক সমাকুল রূপক অপেক্ষা আশু রূপেরই যাঁহারা পক্ষপাতী, তাঁহারা যে এই ভাষার সৃষ্টিমূলে একটা অলৌকিকত্ব আরোপ না করিয়া ছাড়িবেন এরূপ আশা করাই অসঙ্গত।

(২)

না ছাড়ুন, কিন্তু বর্ত্তমানে দ্যুলোক ও ভূলোকের সম্বন্ধটা পূর্ব্বাপেক্ষা যেন বেশী তফাৎ হইয়া পড়িয়াছে। কলির দুর্দ্দান্ত বিজ্ঞানাসুর উভয় রাজ্যের সংযোজক বার্ত্তাবহের তার কাটিয়াছে, লৌহবর্ত্ম ভাঙ্গিয়াছে, প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড সেতুসকল ডিনেমাইটে উড়াইয়াছে।

ভাগীরথীর মত এই দেবভাষার ধারাটাও কি অমরা হইতেই নামিয়া আসিয়াছে? শাস্ত্রজ্ঞেরা বোধ হয় এরূপই একটা সিদ্ধান্ত করেন। কিন্তু বৈজ্ঞানিক যে আবার অন্য রকম ব্যাখ্যা ঝাড়িবেন। তিনি বলিবেন স্বর্গ হইতে তোমার দেবভাষার অবতরণটা আকাশ থেকে ঝুপ করিয়া তোমার ভাগীরথী পড়ার মতই সত্য! আমরা সংস্কৃতকে কেন দেবভাষা বলি ইহাই প্রতিপন্ন করিতে কোমর বাঁধিয়া বসি নাই। এই দৈব উৎপত্তি সম্বন্ধে যতটুকু বলা হইল তাহাই যথেষ্ট। নিজ জন্মভূমির উপর সংস্কৃতের প্রভাব সম্বন্ধে একটু আলোচনা করাই এই প্রসঙ্গের প্রধান উদ্দেশ্য। লাটিন, গ্রীক, মৈসরিক, চৈনিক প্রভৃতি সকল পুরা সাহিত্যেরই নিজ নিজ দেশের উপর বর্ত্তমানেও কিছু না কিছু প্রভাব আছে। কিন্তু এ সম্বন্ধে সংস্কৃতের যতটা, বোধ হয় এই ধরাধামে ততটা কাহারই নাই।

(৩)

সম্পূর্ণ ভাষাটার কথা দূরে থাকুক, ইহার একটা বিন্দুর মধ্যে যে প্রতাপ নিহিত আছে, তাহার কাছে বুঝি প্রলয়ঙ্করী তড়িতশক্তিও হার মানে। বাস্তবিক বিসর্গের বিন্দুদুটীর মধ্যে যে সপ্তসিন্ধুর বল লুক্কায়িত! বিচার বল, তর্ক বল, জ্ঞান বল, বিজ্ঞান বল, কত সময়ে সবই যে ঐ ক্ষুদ্র বিন্দুনিঃসৃত শক্তির প্রবাহে কোথায় একেবারে ভাসিয়া যায়। কত ঐরাবতি পাণ্ডিত্য, কত অভ্রভেদী মহত্ত্ব, কত পগম্বরের সদুক্তি, কত চার্ব্বাকের বদ্‌উক্তি এই ক্ষুদ্রাদপি ক্ষুদ্রের চরণমূলে লুটাপুটি খাইয়াছে! ভাষাতত্ত্ববিদ্ বলুন এমন যাদুশক্তি কি তিনি আর কোন ভাষায় দেখিয়াছেন? তাঁহার লাটিন, গ্রীক,

হিব্রুতে ঐ অনুস্বর বিসর্গের খোঁচার মত এমনটি কি কিছু আছে? যাহা এত ছোট, অনেক সময় দেখিতে গেলে অনুবীক্ষণ লাগাইতে হয়, অথচ যাহার তাড়নে হিমগিরি পর্য্যন্ত কাঁপিয়া উঠে, যাহাকে লিখিতে কিছুমাত্র আয়াস নাই—কলমের এক আঁচড়ে গণ্ডায় গণ্ডায় বাহির হইয়া পড়ে অথচ যাহা হাজার হাজার বৎসর ধরিয়া হাজার হাজার পণ্ডিতের মাথা ঘুলাইয়া দিয়া আসিয়াছে—জানি না ইহার তুলনা কোথাও আছে কিনা!

(৪)

ভাল, এই প্রভাবটার কি কিছু মূল নাই? ইহা কি নিতান্ত অহেতুক, না কেবলমাত্র অতীতের প্রতি অন্ধভক্তিজনিত? অতীত ত সকল জাতিরই আছে। এবং অতীতের প্রতি ভক্তির নিদর্শন অল্পাধিক সর্ব্বত্রই পাওয়া যায়। তবে ভারতে ইহার এতটা আতিশয্য হইয়া পড়িল কেন? অনেকে বলিবেন, ভারতে চিরদিন ইহার আতিশয্য ছিল না। ভারতের যখন জীবন ছিল, তখন ধর্ম্ম ও কর্ম্ম এই দুয়ের মধ্যে একটা সামঞ্জস্য রক্ষা করা হইত। ধর্ম্ম তখন কর্ম্মকে একেবারে অভিভূত করিতে পারিত না। কর্ম্মও ধর্ম্মকে একেবারে টপ্‌কাইয়া উচ্ছৃঙ্খল গতি ধরিত না। ধর্ম্ম, কর্ম্মের রাস টানিয়া থাকিত বটে, কিন্তু তাহাকে চলিতে ফিরিতে দিত—প্রয়োজন হইলে নূতন পথে নূতন ক্ষেত্রে তাহার গতিও ফিরাইত। কিন্তু নির্জীব ভারতে যখন কর্ম্ম অসাড় হইয়া পড়িল, যখন তাহার চেষ্টাশক্তি মুমূর্ষুর অঙ্গস্পন্দনবৎ ক্রমে প্রায় বিলীন হইয়া আসিল, তখন ধর্ম্ম তাহাকে অষ্টবন্ধনে বাঁধিয়া খোঁয়াড়ে পুরিয়া ফেলিল। সেই সময়

হইতে কর্ম্ম কেবল চক্ষুদুটি মুদিয়া মাঝে মাঝে পূর্ব্বভুক্ত খাদ্যের অল্প অল্প জাবর কাটে, আর কিছু বড় তাহাকে করিতে হয় না।

(৫)

কথাটার ভিতর যে কিছুমাত্র সত্য নাই, তাহা বলিতে পারি না কর্ম্মবৈমুখ্যই যে কতকাংশে বিধিব্যবস্থাগত ধর্ম্মের প্রাধান্য বাড়াইয়া দিয়াছে, ইহা না মানিবার কোন কারণই খুঁজিয়া পাই না। কর্ম্মকে নিয়ন্ত্রিত করিবার জন্যই অবশ্য বিধিব্যবস্থার বন্ধন। সেই কর্ম্ম যদি সংকীর্ণ গণ্ডীর মধ্যে আবদ্ধ হইয়া পড়ে—শুধু খাওয়া, পরা, শোয়া, বসার মধ্যেই জীবনটা কোন রকমে একটু নড়িতে চড়িতে থাকে, তবে বিধিব্যবস্থার বন্ধন এই একঘেয়ে কর্ম্মের চারিদিকে দিন দিন খাঁজে খাঁজে কাটিয়া বসিবেই ত! কিন্তু যদি ভাগীরথীকে হিমাচলের শীর্ষ হইতে টানিয়া আনিতে হয়, যদি মৈনাকের দণ্ডে মহাসমুদ্র মন্থন করিতে হয়, যদি সেতুবন্ধন ও খাণ্ডবদাহনে সাম্রাজ্যের বিস্তার করিতে হয়—স্থূল কথায় যখন জীবনটা প্রজ্জ্বলিত উল্কার মত বিপুল কর্ম্মক্ষেত্রে বিদ্যুৎবেগে ঘুরিতে ফিরিতে থাকে, তখন কি আর বিধি ব্যবস্থা একই অক্ষরে, একই মাত্রায় চিরদিনেরতরে আবদ্ধ হইয়া থাকিতে পারে? তখন যে তাহাকে নিত্য নূতন কর্ম্মচক্রের মাঝে বিবর্ত্তিত হইতে হয়—একই স্থানে শ্মশানের বৃষকাষ্ঠের মত খাড়া হইয়া থাকিবার তাহার অবসর কোথায়?

সুতরাং কর্ম্মক্ষেত্রের সংকীর্ণতা যে এতটা প্রভাবের হেতু ইহা স্বীকার করিতে কোন দোষ দেখি না। তবে হেতু হইলেও ইহাই একমাত্র হেতু নয়। হেতু আরো আছে। আমাদের মনে হয়, এই

সম্পর্কে ভারতীয় প্রাচীন সাহিত্যের রীতিটা বিশেষ লক্ষ্যনীয়। সকল দেশেই যাহা কিছু প্রাচীন, তাহাই কতকটা শাস্ত্রের আকার ধারণ করে। প্রাচীন আচার, ব্যবহার, প্রথাবিশেষ কোন শাস্ত্রগ্রন্থের অনুমোদিত হউক আর না হউক, কালক্রমে শাস্ত্র হইয়া দাঁড়ায়। এই নিয়মে পুরাতন সাহিত্যও শাস্ত্রের সম্মান দাবী করে। কিন্তু এই দাবীটা ভারতে যতটা উপ্‌চাইয়া গিয়াছে, এমনটি কোনখানে হয় নাই। ভারতে যেন সংস্কৃত গ্রন্থমাত্রই শাস্ত্র অর্থাৎ ভারতবাসীর কর্ম্মনিয়ামক শাসনদণ্ড। বেদ বেদান্তের কথা মাথায় থাক, তাহা ত ভারতীয় সভ্যতার মূল ভিত্তি, কিন্তু তাহা ছাড়া ছোট বড় যাহা কিছু সংস্কৃতের অন্তর্গত, কোনটাই বা ফেলা যায়। কাব্য, পুরাণ, নাটক, জ্যোতিষ, আয়ুর্ব্বেদ, ব্যাকরণ, উদ্ভট কোনটাই বা কম। বিচার বিতর্কে যেখান হইতে ইচ্ছা একটা শ্লোক আওড়াও—তা বিষ্ণু-পুরাণই হউক, আর গীতগোবিন্দই হউক, রঘুবংশই হউক আর পঞ্চতন্ত্রই হউক, চানক্যই হউক আর চম্পূই হউক—সকল সময়ে এতটা উচ্চাঙ্গেরও প্রয়োজন নাই, যেন তেন প্রকারে দুটা বিসর্গওয়ালা অক্ষর থাকিলেই যথেষ্ট—আর তোমায় হারায় কে!

(৬)

সংস্কৃত-সাহিত্য শাস্ত্রবহুল তাহার উপর অধিকাংশই শ্লোক নিবদ্ধ কাজেই ইহার প্রভাবও তদনুযায়ী। ইহার যে দুই একটা অঙ্গ শাস্ত্র শ্রেণীর বহির্ভূত ছিল, কালক্রমে চারিদিক হইতে শাস্ত্রের বাতাস লাগিয়া তাহাও শাস্ত্র হইয়া পড়িয়াছে। ইহার এই শ্লোকনিবদ্ধতাও ইহার প্রভাব ব্যাপ্তির কম অনুকূল নহে। সাদাসিধে গদ্যের কথায় ততটা

জোর দাঁড়ায় না। কিন্তু সেই একই কথা যদি শ্লোকের ভিতর দিয়া বাহির হয়, তবে তাহার শক্তি যেন বহু পরিমাণে বাড়িয়া যায়। গদ্য শুধু কথা মাত্র, পদ্যে কথা ত থাকেই, তাহার উপর কিছু না কিছু সুর ও লয় আসিয়া যোগ দেয়। তাই কাটাখোট্টা গদ্য অপেক্ষা সুরলয় সমন্বিত পদ্যের প্রভাব অধিকতর তীব্র। শুধু তীব্র কেন, অধিকতর স্থায়ীও বটে। সাদা কথা যেন স্মৃতির উপর দিয়া ভাসিয়া যায়। কিন্তু তাহাতে সুরলয় সংযুক্ত হইলে, তাহা সুরলয়ের সংঘাতে স্মৃতির মর্ম্মে মর্ম্মে প্রবেশ করে। সম্ভবত সংস্কৃত-সাহিত্য শ্লোকনিবদ্ধ শাস্ত্র বচনের বাহুল্যে ভারতের মর্ম্মে মর্ম্মে এতটা তীব্র ও স্থায়ী রূপে গাঁথিয়া থাকিতে সমর্থ হইয়াছে।

(৭)

কিন্তু এখনও মূল কারণ নির্দ্দেশ করা হয় নাই। মূল বলিতেছি কেন না এই কারণ না থাকিলে কালে অন্য কারণগুলা নিশ্চিতই হীন-বল হইয়া পড়িত। দেবত্বের দাবী, অতীতের প্রতি ভক্তি, ও কর্ম্মক্ষেত্রের সংকীর্ণতা, শাস্ত্ররীতির বাহুল্য ও সুস্বর-শ্লোক-নিবদ্ধতা—এই সকল সংস্কৃত-সাহিত্যের প্রভাবকে দৃঢ়ীভূত করিয়াছে বটে, কিন্তু এই সাহিত্যের ভিত্তি বিশাল প্রস্তরস্তম্ভের উপর না থাকিয়া যদি ধূলি রাশির উপর স্থাপিত হইত, তবে ঐ পাশের খুঁটিগুলা হাজার শক্ত হউক ইহাকে কখনই এতটা সমুন্নত রাখিতে সমর্থ হইত না। জানি, কালের করাল আঘাতে সেই প্রস্তর অনেক স্থানে ফাটিয়াছে, অনেক কাদা মাটি তাহাতে মিশিয়াছে এবং ফাটলে ফাটলে বহু আগাছা শিকড় চালাইয়া তাহাকে জখম করিয়াছে, তাহা হইলেও তাহার প্রস্তরত্ব

কখনই নষ্ট হইবার নহে। কঠোর সাধনা লব্ধ, মহা কল্যাণকর সত্য সমূহই এই পাষাণভিত্তি। এই সত্য সমূহ এই বিপুল সাহিত্যের নানা বিভাগে নানা আকারে অভিব্যক্ত, কোথাও দর্শনের যুক্তি ও তর্কে, কোথাও স্মৃতির বিধি ও নিষেধে, কোথাও কাব্যের অতুলনীয় আদর্শ বৈচিত্র্যে। কিন্তু এই বিশ্ব-জনীন্ সত্য যে কোথাও সাম্প্রদায়িক স্বার্থের সংস্পর্শে মলিনীকৃত হয় নাই, এ কথা অতি বড় ভূতভক্তও বুক ঠুকিয়া বলিতে পারেন কি না সন্দেহ।

(৮)

যিনি পারেন, তাঁহার সহিত আমাদের বিতণ্ডা করিবার এখন প্রয়োজন নাই। এই সংস্কৃতের প্রভাবকে এই হাজার হাজার বৎসর ধরিয়া কে জনসাধারণের মধ্যে প্রতিষ্ঠিত রাখিতে পারিয়াছে এখন আমরা তাহার একটু আলোচনা করিব। সংস্কৃতের প্রভাব কি সংস্কৃতই চিরদিন অক্ষুণ্ণ রাখিয়াছে, না অন্য কাহারও ইহাতে হাত আছে? সংস্কৃত যখন জীবন্ত ভাষা ছিল, অর্থাৎ জনসাধারণের মধ্যে যখন এই ভাষার সাহায্যেই ভাবের আদান প্রদান চলিত, তখনকার কথা অবশ্য স্বতন্ত্র। ইহার তখনকার মূর্ত্তিও অবশ্যই বর্ত্তমান মূর্ত্তি হইতে অনেকাংশে ভিন্নতর ছিল। ব্যাকরণের নিয়ম নিগড়ে তখন ইহা এতটা আবদ্ধ হয় নাই এবং অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্রতর ক্ষেত্রেই ইহা পরিব্যাপ্ত ছিল। কিন্তু ক্রমে এক নিয়মানুগত্য যত প্রবল হইতে লাগিল এবং ক্ষেত্রও যত বাড়িতে লাগিল, নানা মিশ্রণে বর্দ্ধিত জনসাধারণের পক্ষে ইহাকে সম্যকরূপে অবলম্বন করিয়া থাকাও তত অসম্ভব হইয়া দাঁড়াইল।

(৯)

কাজেই ইহার উপর নিয়মভঙ্গের মুদ্গরাঘাত পড়িতে লাগিল। প্রকৃতি প্রত্যয় কৃদন্ত তদ্ধিত সেই আঘাতে ভোঁতা বোঁচা ও চেপ্টা হইয়া ভাঙ্গিয়া-চুরিয়া নানা নূতন আকার ধরিয়া বসিল। জনসাধারণ নিজের সুযোগ ও সুবিধার হাপরে ক্রমে একটা নূতন ভাষা গড়িয়া তুলিল। পণ্ডিতেরা এই নূতন ভাষার দাবী ক্রমে মানিয়া লইলেন। প্রাকৃত জনের সৃষ্ট বলিয়া ইহার নাম রাখিলেন প্রাকৃত। সংস্কৃত সাহিত্য কেবল পণ্ডিতমহলেই আবদ্ধ ছিল, ক্রমে এই প্রাকৃতের ভিতর দিয়া জনসাধারণের ভিতর ছড়াইয়া পড়িল। সমাজে যাঁহারা জ্ঞান-বিদ্যায় মানমর্য্যাদায় বড়, তাঁহারাই সংস্কৃতের চলন রাখিলেন, আপামর জনসাধারণ প্রাকৃতকেই আশ্রয় করিল। রাজার দরবারে, পণ্ডিতের কারবারে সংস্কৃতের আদর রহিল বটে, কিন্তু জনসাধারণের হাটে মাঠে ঘাটে প্রাকৃতই সর্ব্বেসর্ব্বা হইয়া উঠিল। যে উচ্চমত ও আদর্শ এত-দিন সংস্কৃতে নিবদ্ধ ছিল, তাহা ক্রমে অন্ততঃ কতকাংশে প্রাকৃতের মধ্য দিয়া সাধারণের সম্পত্তি হইয়া দাঁড়াইল। তাই সংস্কৃত সাহিত্যের প্রভাব বিস্তারে খোদ সংস্কৃত ছাড়া প্রাকৃতের কার্য্য বড় কম গণ্য নয়।

(১০)

কিন্তু প্রাকৃতের এই প্রাদুর্ভাবও চিরকাল রহিল না। সংস্কৃত ও প্রাকৃতের পরিসর দিন দিন বাড়িয়াই যাইতেছিল। ক্রমে ভারতের এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্য্যন্ত সংস্কৃত ও প্রাকৃতের অধিকার-ভুক্ত হইয়া পড়িল। এত বিস্তৃত ভূভাগে, এত বিভিন্ন জাতির মধ্যে একই ভাষা প্রচলিত রাখা শক্ত হইয়া দাঁড়াইল। কালক্রমে প্রাকৃতকে

শাণে চড়িতে হইল। আবার সে শাণ ও এক প্রকারের নহে, নানা দেশের উপযোগী নানা আকারের। প্রাকৃত এই নানা দেশের নানা আকারের শাণে চড়িয়া ক্রমে মাজিয়া ঘসিয়া নানা রূপে দেখা দিল। বাঙ্গালা, হিন্দী, মারাঠী, গুজরাটী, উড়িয়া কত রূপই না তাহাকে ধরিতে হইল। আমরা বাঙ্গালা সাহিতের আলোচনায় প্রবৃত্ত, প্রাকৃত এই বাঙ্গালা রূপে দেখা দিয়া এখানে কি কার্য্য করিয়াছে, ইহাই এখন দেখিব।

(১১)

বাঙ্গালা দেশ প্রাকৃতকে নিজের শাণে চড়াইয়া অন্য দেশের অপেক্ষা কম ঘসা-মাজা করে নাই। সম্ভবতঃ বেশীই করিয়া থাকিবে। কারণ বাঙ্গালা দেশের প্রাণ বুঝি অন্যদেশের অপেক্ষা অধিকতর কোমল হইয়া পড়িয়াছিল। কঠোর শব্দটুকু বাহির করিবার জন্য যে শক্তিটুকুর প্রয়োজন তাহার প্রকাশে এই দেশটা বুঝি একেবারে অশক্ত না হউক, নিতান্ত অনিচ্ছুক হইয়া উঠিয়াছিল। ইহার উপর বৈষ্ণব ধর্ম্ম ও তৎসহ বৈষ্ণব সাহিত্য সোণায় সোহাগা হইয়া দাঁড়াইল। কীর্ত্তনের অবিরত মর্দ্দনে বাঙ্গালা দেশের ভাষাটা একেবারে যেন কাঠিন্য-মাত্র বর্জ্জিত কোমল মালপোয়া হইয়া গেল। অবশ্য পরবর্ত্তীকালে বঙ্গ-সাহিত্য এই কোমলতার কিয়দংশ পরিহার করিয়া নানা দিকের ওজস্বী শব্দসংযোগে কিছু কাঠিন্য লাভে সমর্থ হইয়াছে।

(১২)

প্রাকৃত্যের অপত্যবৃন্দ পরিপুষ্ট হইয়া উঠিলেই প্রাকৃতের কাজে তাহারা বাহাল হইল। প্রাকৃত কর্ম্মক্ষেত্র হইতে অবসর গ্রহণ করিয়া

প্রাচীন নাটকাদির অঙ্ক মধ্যে চিরদিনের জন্য বিরাম লাভ করিলেন। প্রাকৃত একা এত কাজ সামলাইতে পারিতে ছিল না, এক্ষণে তাহার দুহিতারা সেই কাজ সকলে মিলিয়া বণ্টন করিয়া লওয়া তাহা অবশ্য ভালরূপেই সম্পন্ন হইতে লাগিল। এক্ষণে জিজ্ঞাস্য, বাঙ্গালা বাঙ্গালা-দেশের কাজের ভার লইয়া কি করিল? অবশ্য এলোমেলো গৃহস্থালি গুছাইতেই অনেক দিন কাটিয়া গেল। তারপর সম্ভবতঃ কিছু কিছু সামাজিক ও সরকারি কাজে হাত দিতে তাহার সামর্থ্য জন্মিল। এই-রূপে কার্য্যক্ষেত্র ক্রমে বাড়িয়া চলিল। কার্য্যক্ষেত্রের আয়তন অনুসারে কর্ম্মপটুত্ব ও ক্রমে বৃদ্ধি পাইল। কালক্রমে যখন ইহা বৈষ্ণব যুগে আসিয়া সমুপস্থিত, তখন দেখি ইহার একাঙ্গে প্রায় পূর্ণ বিকাশের অবস্থা। তখন দেখি ইহা অন্যান্য ছোট বড় কাজে সম্পূর্ণ যোগ্য ত বটেই, তাহা ছাড়া সাহিত্যের ক্ষেত্রেও প্রতিষ্ঠা লাভে সমর্থ। ক্রমে এই বিশেষ যুগে ইহা এমন পরিপূর্ণ হইয়া উঠিল যে তাহার দ্বারা বৈষ্ণব কবিগণ যে অতুলনীয় সাহিত্যের সৃষ্টি করিলেন, তাহা বিশ্বসাহিত্যের দরবারেও অতি উচ্চ সম্মানের অধিকারী। কিন্তু এই উন্মেষ ও পরিপুষ্টি কিছু একপেশে রকমের। সম্ভবতঃ মাতামহী সংস্কৃতের দেখা-দেখি বাঙ্গালা ভাষাও পদ্যের বেশী পক্ষপাতী হইয়াছিল। তাই বৈষ্ণবের গীতিকবিতাতে পদ্যের বিকসিত মূর্ত্তি দেখা দিয়াছে। গদ্য অবশ্য তখনও ছিল—বেচা-কেনা হিসাব-নিকাশ ও গৃহস্থালি কখন চরণে চরণে মিলাইয়া চলিতে পারে না—কিন্তু তাহা সাহিত্য নামে অভিহিত হইবার যোগ্যতা লাভ করে নাই। সে যোগ্যতা লাভের জন্য গদ্যকে আরো কত শত বৎসর অপেক্ষা করিতে হইয়াছে। এক বিভিন্ন প্রকৃতির বিদেশী সাহিত্যের সংস্পর্শে না আসিলে আরো কত দিন

অপেক্ষা করিতে হইত তাহা কে জানে। থাক, সে কথা এখনকার নয়।

(১৩)

এক্ষণে এই বাঙ্গালা ভাষা কিরূপে ও কতটা সংস্কৃত সাহিত্যের প্রভাব বিস্তারে সহায়তা করিয়াছে, ইহাই দ্রষ্টব্য। প্রাকৃত সংস্কৃত সাহিত্যের প্রভাব যে জনসাধারণের মধ্যে কতকটা বিস্তৃত করিয়াছিল, ইহা মানিতে হয়, কিন্তু এ সম্পর্কে প্রাকৃতের দুহিতাদিগের কার্য্য বিশেষ রূপে উল্লেখযোগ্য। হিন্দু প্রাকৃত—অবশ্য বৌদ্ধ প্রাকৃতের কথা স্বতন্ত্র—একটা বিভিন্ন সাহিত্যের সৃষ্টি বড় করে নাই। সংস্কৃত সাহিত্য এই প্রাকৃতকে নিজের অঙ্গীভূত করিয়া লইয়াছিল। কিন্তু প্রাকৃতের দুহিতাদিগের বেলা সে নিয়ম খাটে নাই। নিশ্চয়ই দূরসম্পর্কবশতঃ উভয় পক্ষের সাদৃশ্যগত যোগও ততটা থাকিতে পারে না। জননীর সহিত দুহিতার যতটা সাদৃশ্য থাকা সম্ভব, মাতামহীর সহিত দৌহিত্রীর ততটা সাদৃশ্য না থাকিবারই কথা। যাহাই হউক, ইহা দেহিত্রীদিগের সৌভাগ্য বলিতে হইবে। মহাসম্পদশালী সংস্কৃত সাহিত্যের সাহচর্য্য অবশ্যই গৌরবের বিষয় বটে, কিন্তু সতন্ত্র স্বাধীন অস্তিত্ব কম গৌরব-জনক নহে। অন্যের কথা ছাড়িয়া বাঙ্গালার কথাই বলি। যদি প্রাকৃতের মত আমাদের এই বাঙ্গালা ভাষা সংস্কৃতের সহিত জড়িত থাকিত, তবে ইহার এতটা উন্মেষ ও উন্নতি কি কোন কালে ঘটিয়া উঠিত? ইহার স্বাতন্ত্র্যই ইহাকে এমন শক্তি দিয়াছে, যাহাতে এই সাহিত্য এক দিন বিশ্বসাহিত্যের অঙ্গীভূত হইবার স্পর্দ্ধা রাখে।

প্রাকৃত অপেক্ষা বাঙ্গালাদেশে বাঙ্গালাই সংস্কৃত সাহিত্যের প্রভাব বাজায় রাখিতে সমর্থ। কেন? কারণ প্রাকৃত সংস্কৃতের অঙ্গমাত্র,

বাঙ্গালা স্বাধীন স্বতন্ত্র ভাষা। বাঙ্গালার অনুবাদ-সাহিত্যের সাহায্যে সংস্কৃতের প্রভাব যতটা বাঙ্গালায় বিস্তৃত হইতে পারে প্রাকৃতের দ্বারা ততটা হইতে পারে না। পুচ্ছগ্রাহিতা ও স্বাতন্ত্র্যের এই প্রভেদ। আধুনিক অনুবাদ-সাহিত্যের কথা ছাড়িয়া দিতেছি—তাহা ত আগম নিগম দর্শন পুরাণ হইতে আরম্ভ করিয়া সংস্কৃতের সর্ব্বাঙ্গই সাধারণের মধ্যে প্রচারে উন্মুখ—প্রাচীন অনুবাদ-সাহিত্যও এই হিসাবে বড় কম কাজ করে নাই। আগম, নিগম, দর্শন সাধারণের নিকট প্রচারিত হইলেও সাধারণ তাহা ধরিতে ছুঁইতে পারে না, পুরাণের মনোমহিনী আখ্যানমালাই তাহাদের সমধিক চিত্তাকর্ষক। তাই কয়েক শতাব্দী পূর্ব্বে কাশীরাম ও কৃত্তিবাস যাহা করিয়াছেন, তাহা বাঙ্গালা অনুবাদ সাহিত্যে অতুলনীয়। বেদ বেদান্ত পণ্ডিতদিগের জন্য, পুরাণসমূহ বিশেষতঃ রামায়ণ ও মহাভারত ভারতীয় লোকশিক্ষার প্রধানতম সাধন। এই রামায়ণ ও মহাভারতকে যাঁহারা জনসাধারণের আয়ত্ত করিয়া দিয়াছিলেন, তাঁহারা ধন্য।

(১৪)

পুরাতন অনুবাদ-সাহিত্য আরো অনেক থাকিতে পারে কিন্তু তাহার অধিকাংশই শুধু প্রত্নতত্ত্বের কুক্ষিগত হইয়াই এখন বর্ত্তমান। সে সকলের উল্লেখ এ ক্ষেত্রে নিষ্প্রয়োজন, কাশীরাম ও কৃত্তিবাসই এ সম্পর্কে বিশেষ আলোচনার জিনিস। কাশীরাম ও কৃত্তিবাসের পুরাণাখ্যান অনুবাদ-সাহিত্য বলিয়া আখ্যাত বটে কিন্তু তাহা যথার্থ অনুবাদ নহে। কালীসিংহের ও বর্দ্ধমান রাজবাটির মহাভারত যে হিসাবে অনুবাদ, কাশীরাম ও কৃত্তিবাস সেরূপ কিছু নহে। আক্ষরিক সাদৃশ্য

দূরে থাকুক, আখ্যানবস্তু সম্বন্ধেই মূলের সহিত ইহাঁদের পার্থক্য আছে। ইহাঁরা বাল্মীকির রামায়ণ ও ব্যাসের মহাভারত খুলিয়া আভিধানিক আলঙ্কারিক বা দার্শনিক তত্ত্বসমূহের নির্ণয়পূর্ব্বক একটী খসড়া করিতে বসেন নাই। তাঁহারা হাতের কাছে অতি সহজে যে উপকরণ পাইয়াছিলেন, তাহারই সাহায্যে নিজেদের এই অপূর্ব্ব কাব্য গড়িয়া তুলিয়াছেন।

(১৫)

এখন যেমন অসংখ্য গ্রন্থ মুদ্রাযন্ত্রের সাহায্যে চারিদিকে ছড়াইয়া পড়িয়া লোকশিক্ষার কাজ করিতেছে, পূর্ব্বে ত এমন ছিল না। তবে লোকশিক্ষা চলিত কি প্রকারে? এখন আক্ষরিক জ্ঞানও বিদ্যালয়সমূহের সহায়তায় চারিদিকে বিস্তার লাভ করিতেছে কিন্তু পূর্ব্বে এই জ্ঞান বড়ই সীমাবদ্ধ ছিল। তবে নিরক্ষরের শিক্ষা হইত কি উপায়ে? ভারতবর্ষের প্রায় সর্ব্বত্র এক শ্রেণীর লোকশিক্ষক ছিলেন এখনও আছেন। পূর্ব্বাপেক্ষা এখন অবশ্যই তাঁহাদের সংখ্যা অনেক কমিয়া গিয়াছে। বাঙ্গালায় ইহাঁদের নাম কথক। এই কথকেরাই অন্ততঃ কতকাংশে তখন মুদ্রাযন্ত্রের কার্য্য করিতেন। তাঁহারা বেদ বা উপনিষদের ব্যাখ্যাতা ছিলেন না। ততটা পাণ্ডিত্যেরও তাঁহাদের প্রয়োজন হয় নাই। তাঁহারা বুধমণ্ডলীর জন্যও দেখা দেন নাই। ভারতীয় আর্য্য-সভ্যতার কিয়দংশ জনসাধারণকে বুঝাইয়া দেওয়াই ছিল ইহাঁদের প্রধানতম কার্য্য। সেই কার্য্য সম্পাদনের নিমিত্ত দার্শনিক আলোচনার দরকার হয় নাই। সাধারণের সম্মুখে দর্শন চিরকালই অদর্শন। এস্থলে লোকবিমোহন

উপাখ্যানমালা অবলম্বন করাই শিক্ষকের বুদ্ধিমত্তার নিদর্শন। কথক-শ্রেণীর মধ্যে এই নিদর্শনের অভাব লক্ষিত হয় নাই। তাঁহারা দর্শন ছাড়িয়া পুরাণকেই বেশী করিয়া প্রচার করিয়াছিলেন।

(১৬)

এই পুরাণে অবশ্যই অনেক আজগুবি গল্প আছে, অনেক অসম্ভব অনুষ্ঠান আছে, অনেক অপ্রাকৃত ঘটনার সমাবেশ আছে। কথকেরা সেই অপ্রাকৃত ও অসম্ভবকে ছাঁটিয়া ফেলেন নাই। বরং মূলে যাহা সম্ভবপর ছিল, তাহাকে অসম্ভবই করিয়াছেন, যাহা অসম্ভব ছিল তাহা আরো বহু পরিমাণে অদ্ভুত করিতে ছাড়েন নাই। এবং যাহাকে কোন রকমে ঘুরাইয়া ফিরাইয়া প্রাকৃতিক নিয়মের অধীন করা যাইত, তাহার উপর গাঢ় রংয়ের পোঁচ লাগাইয়া প্রকৃতির নখাগ্রের সামান্য দাগটুকু পর্য্যন্ত শেষ করিয়া দিয়াছেন। ব্যাস ও বাল্মীকির কাছে পঞ্চভূত নিশ্চয়ই এতটা লাঞ্ছিত হয় নাই।

পাঞ্চভৌতিক প্রকৃতি ছাড়া এই কথকদিগের নিকট আখ্যানান্তর্গত ব্যক্তিবর্গের প্রকৃতিও অনেক লাঞ্ছিত হইয়াছে। শুধু প্রকৃতি কেন সেই ব্যক্তিবর্গের আকৃতিও যে কিছু বিড়ম্বনা সহিয়াছে একথাও বলা চলে। তাঁহারা যেখানে সুবিধা পাইয়াছেন, সেখানেই কাহারও পুচ্ছ, কাহারও কর্ণ, কাহারও নাসিকা টানিয়া যতদূর পারেন লম্বা করিয়া দিয়াছেন। মোট কথা আকৃতিসম্বন্ধে তাঁহারা বাড়ানর দিকেই গিয়াছেন, কমানর দিকে একেবারেই যান নাই। কিন্তু প্রকৃতিসম্বন্ধে ঠিক বিপরীত ঘটিয়াছে। মূলে যিনি যতটা উচ্চ স্থান অধিকার করিয়াছিলেন, অনুবাদে তাহাদের মধ্যে অনেককেই কিছু খাটো হইতে

হইয়াছে। বীরের বীরত্ব, মহতের মহত্ত্ব এমন কি ধীরের ধীরত্বও মূলের অনুসারে যথাযথ অঙ্কিত হয় নাই। কিন্তু ইহাঁদের নিকট সেরূপ আশা করাই অন্যায়। ব্যাস ও বাল্মীকির দ্বারা ইহাঁরা ঠিক অনুপ্রাণিত নহেন। ব্যাস ও বাল্মীকির প্রতিভাই বা ইহাঁরা কোথায় পাইবেন?

(১৭)

আমরা কথকদিগের সম্বন্ধে যাহা বলিলাম, কাশীদাস ও কৃত্তিবাসে তাহা পূর্ণমাত্রায় বর্ত্তমান। কারণ ইহাঁরা কথককবি। পূর্ব্বগামী কথকদিগের অনুসরণেই ইহাঁদের কাব্য রচিত হইয়াছে। সুতরাং এই কাব্যে অসম্ভব, অপ্রাকৃত, আজগুবি বহুল পরিমাণেই দেখা যাইবে ঘটনাপুঞ্জের সামঞ্জস্যের অভাবও অনেক লক্ষিত হইবে, অনেক স্থলে খুব মহৎকেও অপেক্ষাকৃত হীন দেখাইবে। কিন্তু সমগ্র কাব্য জন-সাধারণের শিক্ষাকল্পে যাহা করিয়াছে, তাহার তুলনায় এইসকল দোষ ধর্ত্তব্যের মধ্যেই নয়। প্রাচীনকালের বিশিষ্ট উচ্চ বংশের বৃত্তান্ত কতক পাওয়া যায় বটে, কিন্তু জনসাধারণের ইতিহাস বড় কিছু নাই। পৌরাণিক যুগে এই জনসাধারণের শিক্ষা কিরূপ ছিল এবং কিরূপেই বা তাহা সম্পাদিত হইত, সে সম্বন্ধে প্রত্নতাত্ত্বিক বেশী কিছু সংগ্রহ করিতে পারিয়াছেন বলিয়া মনে হয় না। কিন্তু কথকতার সৃষ্টির সঙ্গে সঙ্গে জনশিক্ষার একটা যে বন্দোবস্ত হইয়া গিয়াছে, এটা বেশ বুঝিতে পারি। কারণ এই কথকতার উপর প্রতিষ্ঠিত কাশীরামী-মহাভারত ও কৃত্তিবাসী-রামায়ণের কার্য্য দেখিলে বিস্মিত হইতে হয়। এই অনুবাদ-সাহিত্য সাধারণের উপর মূল সাহিত্যের প্রভাব কতদূর

জাগাইয়া রাখিয়াছে, তাহা বলিয়া শেষ করা যায় না। শুধু সংস্কৃতের গণ্ডী কতটুকু—সংস্কৃত শিক্ষা ত মুষ্টিমেয়ের মধ্যে আবদ্ধ। অবশিষ্টের উপায় কি? মূল অপেক্ষা অনুবাদ-সাহিত্যই ইহাদের সাক্ষাৎ শিক্ষক, গুরু ও উপদেষ্টা। এই সাহিত্যই মহান্ চরিত্রের চিত্র তাহাদের সম্মুখে ধরিয়া মানুষের মহত্ত্ব বুঝাইয়া দিয়াছে। ইহাই তাহাদিগকে স্বার্থ ও পরার্থ, সংযম ও স্বেচ্ছাচার, ভোগ ও ত্যাগের তারতম্য প্রদর্শন করিয়াছে। ইহাই তাহাদিগের চিত্তে উচ্চ বৃত্তি-নিচয়ের আকাঙ্ক্ষা জাগাইয়াছে। সংসার, সমাজ ও সাম্রাজ্যগত কর্ত্তব্যসমূহের আদর্শালোক এই অনুবাদ-সাহিত্যের উপগ্রহ হইতেই জনসাধারণের মধ্যে বিকীর্ণ হইয়াছে। মূল গ্রন্থের সহিত ইহাদের পরিচয় খুবই কম। ব্যাস ও বাল্মীকির কাব্য সাধারণের নিকট কতকটা যেন বিষ্ণুপদ বা গোমুখীধারা, এতটা উচ্চে তাহারা উঠিতে অক্ষম—তাহারা কাশীরাম বা কৃত্তিবাসী অনুবাদ-সাহিত্যের ভাগী-রথীতে অবগাহন করিয়াই কৃতার্থ।

শ্রীদয়াল চন্দ্র ঘোষ।

পয়লা নম্বর।

—:০:—

আমি তামাকটা পর্য্যন্ত খাইনে। আমার এক অভ্রভেদী নেশা আছে তারই আওতায় অন্য সকল নেশা একেবারে শিকড় পর্য্যন্ত শুকিয়ে মরে গেচে। সে আমার বই পড়ার নেশা। আমার জীবনের মন্ত্রটা ছিল এই ঃ—

যাবজ্জীবেৎ নাই বা জীবেৎ
ঋণং কৃত্বা বহিং পঠেৎ।

যাদের বেড়াবার সখ বেশী অথচ পাথেয়ের অভাব, তারা যেমন করে টাইম-টেবল্ পড়ে, অল্প বয়সে আর্থিক অসদ্ভাবের দিনে আমি তেমনি করে বইয়ের ক্যাটালগ পড়তুম। আমার দাদার এক খুড়-শ্বশুর বাংলা বই বেরবামাত্র নির্ব্বিচারে কিনতেন এবং তাঁর প্রধান অহঙ্কার এই যে সে বইয়ের একখানাও তাঁর আজ পর্য্যন্ত খোওয়া যায় নি। বোধ হয় বাংলাদেশে এমন সৌভাগ্য আর কারো ঘটে না। কারণ ধন বল, আয়ু বল, অন্যমনস্ক ব্যক্তির ছাতা বল, সংসারে যত কিছু সরণশীল পদার্থ আছে বাংলা বই হচ্চে সকলের চেয়ে সেরা। এর থেকে বোঝা যাবে দাদার খুড়শ্বশুরের বইয়ের আলমারির চাবি দাদার খুড়শাশুড়ির পক্ষেও দুর্লভ ছিল। "দীন যথা রাজেন্দ্র সঙ্গমে" আমি যখন ছেলেবেলায় দাদার সঙ্গে তাঁর শ্বশুরবাড়ি যেতুম ঐ রুদ্ধদ্বার আল্‌মারিগুলোর দিকে তাকিয়ে সময় কাটিয়েচি। তখন

আমার চক্ষুর জিভে জল এসেচে। এই বল্লেই যথেষ্ট হবে ছেলেবেলা থেকেই এত অসম্ভব রকম বেশী পড়েচি যে, পাস্ করতে পারি নি। যতখানি কম পড়া পাস করার পক্ষে অত্যাবশ্যক তার সময় আমার ছিল না।

আমি ফেল্-করা ছেলে বলে আমার একটা মস্ত সুবিধে এই যে, বিশ্ববিদ্যালয়ের ঘড়ায়, বিদ্যার তোলা জলে, আমার স্নান নয়—স্রোতের জলে অবগাহনই আমার অভ্যাস। আজকাল আমার কাছে অনেক বিএ, এম্এ, এসে থাকে; তারা যতই আধুনিক হোক্ আজও তারা ভিক্টোরীয় যুগের নজরবন্দী হয়ে বসে আছে। তাদের বিদ্যার জগৎ টলেমির পৃথিবীর মত, আঠারো উনিশ শতাব্দীর সঙ্গে একেবারে যেন ইস্কু দিয়ে আঁটা, বাংলাদেশের ছাত্রের দল পুত্র-পৌত্রাদিক্রমে তাকেই যেন চিরকাল প্রদক্ষিণ করতে থাকবে। তাদের মানস-রথযাত্রার গাড়িখানা বহুকষ্টে মিল বেন্থাম পেরিয়ে কার্লাইল রাস্কিনে এসে কাৎ হয়ে পড়েচে। মাষ্টার মশায়ের বুলির বেড়ার বাইরে তারা সাহস করে হাওয়া খেতে বেরয় না।

কিন্তু আমরা যে-দেশের সাহিত্যকে খোঁটার মত করে মনটাকে বেঁধে রেখে জাওর কাটাচ্চি সেদেশে সাহিত্যটা ত স্থানু নয়—সেটা সেখানকার প্রাণের সঙ্গে সঙ্গে চল্‌ছে। সেই প্রাণটা আমার না থাকতে পারে কিন্তু সেই চলাটা আমি অনুসরণ করতে চেষ্টা করেচি। আমি নিজের চেষ্টায় ফরাসী জর্ম্মাণ ইটালিয়ান শিখে নিলুম; অল্পদিন হল রাশিয়ান শিখতে সুরু করেছিলুম। আধুনিকতার যে একস্‌প্রেস্ গাড়িটা ঘণ্টায় ষাট মাইলের চেয়ে বেগে ছুটে চলেচে, আমি তারই টিকিট কিনেচি। তাই আমি হাক্সলি ডারুয়িনে এসেও ঠেকে যাই

নি, টেনিসন্‌কেও বিচার করতে ডরাইনে, এমন কি, ইবসেন মেটার-লিঙ্কের নামের নৌকা ধরে আমাদের মাসিক সাহিত্যে সস্তা খ্যাতির বাঁধা কারবার চালাতে আমার সঙ্কোচ বোধ হয়।

আমাকেও কোনোদিন একদল মানুষ সন্ধান করে চিনে নেবে এ আমার আশার অতীত ছিল। আমি দেখচি বাংলাদেশে এমন ছেলেও দু'চারটে মেলে যারা কলেজও ছাড়ে না অথচ কলেজের বাইরে সরস্বতীর যে বীণা বাজে তার ডাকেও উতলা হয়ে ওঠে। তারাই ক্রমে ক্রমে দুটি একটি করে আমার ঘরে এসে জুটতে লাগল।

এই আমার এক দ্বিতীয় নেশা ধরল—বকুনি। ভদ্রভাষায় তাকে আলোচনা বলা যেতে পারে। দেশের চারদিকে সাময়িক ও অসাময়িক সাহিত্যে যে সমস্ত কথাবার্ত্তা শুনি তা একদিকে এত কাঁচা অন্যদিকে এত পুরণো যে মাঝে মাঝে তার হাঁফ-ধরানো ভাপ্‌সা গুমোটটাকে উদার চিন্তার খোলা হাওয়ায় কাটিয়ে দিতে ইচ্ছা করে। অথচ লিখতে কুঁড়েমি আসে। তাই মন দিয়ে কথা শোনে এমন লোকের নাগাল পেলে বেঁচে যাই।

দল আমার বাড়তে লাগল। আমি থাকতুম আমাদের গলির দ্বিতীয় নম্বর বাড়িতে, এদিকে আমার নাম হচ্চে অদ্বৈতচরণ, তাই আমাদের দলের নাম হয়ে গিয়েছিল দ্বৈতাদ্বৈত সম্প্রদায়। আমাদের এই সম্প্রদায়ের কারো সময় অসময়ের জ্ঞান ছিল না। কেউ বা পাঞ্চ-করা ট্রামের টিকিট দিয়ে পত্রচিহ্নিত একখানা নূতন প্রকাশিত ইংরেজি বই হাতে করে সকালে এসে উপস্থিত—তর্ক করতে করতে একটা বেজে যায় তবু তর্ক শেষ হয় না। কেউ বা সদ্য কলেজের নোট নেওয়া খাতাখানা নিয়ে বিকেলে এসে হাজির, রাত যখন দুটো

তখনো ওঠবার নাম করে না। আমি প্রায় তাদের খেতে বলি। কারণ, দেখেচি সাহিত্য চর্চ্চা যারা করে তাদের রসজ্ঞতার শক্তি কেবল মস্তিষ্কে নয় রসনাতেও খুব প্রবল। কিন্তু যাঁর ভরসায় এই সমস্ত ক্ষুধিতদের যখন-তখন খেতে বলি তাঁর অবস্থা যে কি হয় সেটাকে আমি তুচ্ছ বলেই বরাবর মনে করে আসতুম। সংসারে ভাবের ও জ্ঞানের যে সকল বড় বড় কুলাল চক্র ঘুরচে, যাতে মানব সভ্যতা কতক বা তৈরি হয়ে আগুনের পোড় খেয়ে শক্ত হয়ে উঠচে, কতক বা কাঁচা থাকতে থাকতেই ভেঙে ভেঙে পড়চে তার কাছে ঘর-করনার নড়াচড়া এবং রান্নাঘরের চুলোর আগুন কি চোখে পড়ে?

ভবানীর ভ্রূকুটিভঙ্গী ভবই জানেন এমন কথা কাব্যে পড়েচি। কিন্তু ভবের তিন চক্ষু; আমার এক জোড়ামাত্র—তারও দৃষ্টিশক্তি বই পড়ে পড়ে ক্ষীণ হয়ে গেছে। সুতরাং অসময়ে ভোজের আয়োজন করতে বল্লে আমার স্ত্রীর ভ্রূ-চাপে কি রকম চাপল্য উপস্থিত হত তা আমার নজরে পড়ত না। ক্রমে তিনি বুঝে নিয়েছিলেন আমার ঘরে অসময়ই সময় এবং অনিয়মই নিয়ম। আমার সংসারের ঘড়ি তাল-কানা, এবং আমার গৃহস্থালির কোটরে কোটরে ঊনপঞ্চাশ পবনের বাসা। আমার যা-কিছু অর্থসামর্থ্য তার একটিমাত্র খোলা ড্রেন ছিল, সে হচ্চে বই-কেনার দিকে; সংসারের অন্য প্রয়োজন হ্যাংলা কুকুরের মত এই আমার সখের বিলিতি কুকুরের উচ্ছিষ্ট চেটে ও শুঁকে কেমন করে যে বেঁচে ছিল তার রহস্য আমার চেয়ে আমার স্ত্রী বেশী জানতেন।

নানা জ্ঞানের বিষয়ে কথা কওয়া আমার মত লোকের পক্ষে নিতান্ত দরকার। বিদ্যা জাহির করবার জন্যে নয়, পরের উপকার

করবার জন্যেও নয়; ওটা হচ্চে কথা কয়ে কয়ে চিন্তা করা, জ্ঞান হজম করবার একটা ব্যায়াম-প্রণালী। আমি যদি লেখক হতুম, কিম্বা অধ্যাপক হতুম তাহলে বকুনি আমার পক্ষে বাহুল্য হত। যাদের বাঁধা খাটুনি আছে খাওয়া হজম করবার জন্যে তাদের উপায় খুঁজতে হয় না—যারা ঘরে বসে খায় তাদের অন্তত ছাতের উপর হন্‌হন্ করে পায়চারি করা দরকার। আমার সেই দশা। তাই যখন আমার দ্বৈত দলটি জমে নি—তখন আমার একমাত্র দ্বৈত ছিলেন আমার স্ত্রী। তিনি আমার এই মানসিক পরিপাকের সশব্দ প্রক্রিয়া দীর্ঘকাল নিঃশব্দে বহন করেচেন। যদিচ তিনি পরতেন মিল্-এর সাড়ি, এবং তাঁর গয়নার সোনা খাঁটি এবং নিরেট ছিল না কিন্তু স্বামীর কাছ থেকে যে-আলাপ শুনতেন—সৌজাত্য বিদ্যাই (Eugenics) বল, মেণ্ডেল তত্ত্বই বল, আর গাণিতিক যুক্তিশাস্ত্রই বল—তার মধ্যে সস্তা কিম্বা ভেজাল-দেওয়া কিছুই ছিল না। আমার দল বৃদ্ধির পর হ'তে এই আলাপ থেকে তিনি বঞ্চিত হয়েছিলেন কিন্তু সেজন্যে তাঁর কোনো নালিশ কোনোদিন শুনি নি।

আমার স্ত্রীর নাম অনিলা। ঐ শব্দটার মানে কি তা আমি জানি নে, আমার শ্বশুরও যে জানতেন তা নয়। শব্দটা শুনতে মিষ্ট এবং হঠাৎ মনে হয় ওর একটা-কোনো মানে আছে। অভিধানে যাই বলুক নামটার আসল মানে—আমার স্ত্রী তাঁর বাপের আদরের মেয়ে। আমার শাশুড়ি যখন আড়াই বছরের একটি ছেলে রেখে মারা যান তখন সেই ছোট ছেলেকে যত্ন করবার মনোরম উপায়স্বরূপে আমার শ্বশুর আর একটি বিবাহ করেন। তাঁর উদ্দেশ্য যে কি রকম সফল হয়েছিল তা এই বল্লেই বোঝা যাবে যে, তাঁর মৃত্যুর দু'দিন আগে তিনি

অনিলার হাত ধরে বল্লেন, "মা, আমি ত যাচ্চি, এখন সরোজের কথা ভাববার জন্যে তুমি ছাড়া আর কেউ রইল না।" তাঁর স্ত্রী ও দ্বিতীয় পক্ষের ছেলেদের জন্যে কি ব্যবস্থা করলেন তা আমি ঠিক জানিনে। কিন্তু অনিলার হাতে গোপনে তিনি তাঁর জমানো টাকা প্রায় সাড়ে সাত হাজার দিয়ে গেলেন। বল্লেন, এ টাকা সুদে খাটাবার দরকার নেই—নগদ খরচ করে এর থেকে তুমি সরোজের লেখাপড়ার ব্যবস্থা করে দিয়ো।

আমি এই ঘটনায় কিছু আশ্চর্য্য হয়েছিলুম। আমার শ্বশুর কেবল বুদ্ধিমান ছিলেন তা নয়, তিনি ছিলেন যাকে বলে বিজ্ঞ। অর্থাৎ ঝোঁকের মাথায় কিছুই করতেন না, হিসেব করে চলতেন। তাই তাঁর ছেলেকে লেখাপড়া শিখিয়ে মানুষ করে তোলার ভার যদি কারো উপর তাঁর দেওয়া উচিত ছিল সেটা আমার উপর, এ বিষয়ে আমার সন্দেহ ছিল না। কিন্তু তাঁর মেয়ে তাঁর জামাইয়ের চেয়ে যোগ্য এমন ধারণা যে তাঁর কি করে হল তা ত বল্‌তে পারি নে। অথচ টাকাকড়ি সম্বন্ধে তিনি যদি আমাকে খুব খাঁটি বলে না জানতেন তাহলে আমার স্ত্রীর হাতে এত টাকা নগদ দিতে পারতেন না। আসল তিনি ছিলেন ভিক্টোরীয় যুগের ফিলিস্‌টাইন, আমাকে শেষ পর্য্যন্ত চিন্‌তে পারেন নি।

মনে মনে রাগ করে আমি প্রথমটা ভেবেছিলুম এ সম্বন্ধে কোনো কথাই কব না। কথা কইও নি। বিশ্বাস ছিল কথা অনিলাকেই প্রথম কইতে হবে, এ সম্বন্ধে আমার শরণাপন্ন না হয়ে তার উপায় নেই। কিন্তু অনিলা যখন আমার কাছে কোনো পরামর্শ নিতে এল না তখন মনে করলুম ও বুঝি সাহস করচে না। শেষে একদিন কথায়

কথায় জিজ্ঞাসা করলুম, "সরোজের পড়াশুনোর কি করচ?" অনিলা বল্লে, "মাষ্টার রেখেচি, ইস্কুলেও যাচ্চে।" আমি আভাস দিলুম, সরোজকে শেখাবার ভার আমি নিজেই নিতে রাজি আছি। আজ-কাল বিদ্যাশিক্ষার যে সকল নতুন প্রণালী বেরিয়েচে তার কতক কতক ওকে বোঝাবার চেষ্টা করলুম। অনিলা হাঁও বল্লে না, নাও বল্লে না। এতদিন পরে আমার প্রথম সন্দেহ হল অনিলা আমাকে শ্রদ্ধা করে না। আমি কলেজে পাস করিনি সেইজন্য সম্ভবত ও মনে করে পড়াশুনো সম্বন্ধে পরামর্শ দেবার ক্ষমতা এবং অধিকার আমার নেই। এতদিন ওকে সৌজাত্য, অভিব্যক্তিবাদ এবং রেডিয়ো-চাঞ্চল্য সম্বন্ধে যা কিছু বলেচি নিশ্চয়ই অনিলা তার মূল্য কিছুই বোঝে নি। ও হয়ত মনে করেচে সেকেণ্ড ক্লাসের ছেলেও এর চেয়ে বেশী জানে। কেননা মাষ্টারের হাতের কান-মলার প্যাঁচে প্যাঁচে বিদ্যেগুলো আঁট হয়ে তাদের মনের মধ্যে বসে গেচে। রাগ করে মনে মনে বল্লুম, মেয়েদের কাছে নিজের যোগ্যতা প্রমাণ করবার আশা সে যেন ছাড়ে বিদ্যাবুদ্ধিই যার প্রধান সম্পদ।

সংসারে অধিকাংশ বড় বড় জীবন-নাট্য যবনিকার আড়ালেই জমতে থাকে, পঞ্চমাঙ্কের শেষে সেই যবনিকা হঠাৎ উঠে যায়। আমি যখন আমার দ্বৈতদের নিয়ে বের্গসির তত্ত্বজ্ঞান ও ইব্‌সেনের মনস্তত্ত্ব আলো-চনা করচি তখন মনে করেছিলুম অনিলার জীবন-যজ্ঞবেদীতে কোনো আগুনই বুঝি জ্বলে নি। কিন্তু আজকে যখন সেই অতীতের দিকে পিছন ফিরে দেখি তখন স্পষ্ট দেখতে পাই যে-সৃষ্টিকর্ত্তা আগুনে পুড়িয়ে হাতুড়ি পিটিয়ে জীবনের প্রতিমা তৈরি করে থাকেন অনিলার মর্ম্মস্থলে তিনি খুবই সজাগ ছিলেন। সেখানে একটি ছোটভাই,

একটি দিদি এবং একটি বিমাতার সমাবেশে নিয়তই একটা ঘাত-প্রতিঘাতের লীলা চলছিল। পুরাণের বাসুকী যে পৌরাণিক পৃথিবীকে ধরে আছে সে পৃথিবী স্থির। কিন্তু সংসারে যে-মেয়েকে বেদনার পৃথিবী বহন করতে হয় তার সে-পৃথিবী মুহূর্ত্তে মুহূর্ত্তে নূতন নূতন আঘাতে তৈরি হয়ে উঠচে। সেই চল্‌তি ব্যথার ভার বুকে নিয়ে যাকে ঘরকরনার খুঁটিনাটির মধ্য দিয়ে প্রতিদিন চল্‌তে হয় তার অন্তরের কথা অন্তর্য্যামী ছাড়া কে সম্পূর্ণ বুঝবে? অন্তত আমি ত কিছুই বুঝি নি। কত উদ্বেগ, কত অপমানিত প্রয়াস, পীড়িত স্নেহের কত অন্তর্গূঢ় ব্যাকুলতা, আমার এত কাছে নিঃশব্দতার অন্তরালে মথিত হয়ে উঠছিল আমি তা জানিই নি। আমি জানতুম যেদিন দ্বৈতদলের ভোজের বার উপস্থিত হত সেইদিনকার উদ্যোগ পর্ব্বই অনিলার জীবনের প্রধান পর্ব্ব। আজ বেশ বুঝতে পারচি পরম ব্যথার ভিতর দিয়েই এ সংসারে এই ছোটভাইটিই দিদির সবচেয়ে অন্তরতম হয়ে উঠেছিল। সরোজকে মানুষ করে তোলা সম্বন্ধে আমার পরামর্শ ও সহায়তা এরা সম্পূর্ণ অনাবশ্যক বলে উপেক্ষা করাতে আমি ওদিকটাতে একেবারে তাকাই নি, তার যে কি রকম চল্‌চে সে কথা কোনোদিন জিজ্ঞাসাও করি নি।

ইতিমধ্যে আমাদের গলির পয়লা নম্বর বাড়িতে লোক এল। এ বাড়িটি সেকালের বিখ্যাত ধনী মহাজন উদ্ধব বড়ালের আমলে তৈরি। তারপরে দুই পুরুষের মধ্যে সে বংশের ধন জন প্রায় নিঃশেষ হয়ে এসেচে, দুটি একটি বিধবা বাকি আছে। তারা এখানে থাকে না, তাই বাড়িটা পোড়ো অবস্থাতেই আছে। মাঝে মাঝে বিবাহ প্রভৃতি ক্রিয়াকাণ্ডে এ বাড়ি কেউ কেউ অল্পদিনের জন্যে ভাড়া নিয়ে

থাকে, বাকি সময়টা এত বড় বাড়ির ভাড়াটে প্রায় জোটে না। এবারে এলেন—মনে কর তাঁর নাম রাজা সিতাংশু মৌলি—এবং ধরে নেওয়া যাক্ তিনি নরোত্তম পুরের জমিদার।

আমার বাড়ির ঠিক পাশেই অকস্মাৎ এত বড় একটা আবির্ভাব আমি হয়ত জানতেই পারতুম না। কারণ, কর্ণ যেমন একটি সহজ কবচ গায়ে দিয়েই পৃথিবীতে এসেছিলেন আমারও তেমনি একটি বিধিদত্ত সহজ কবচ ছিল। সেটি হচ্চে আমার স্বাভাবিক অন্যমনস্কতা। আমার এ বর্ম্মটি খুব মজবুৎ ও মোটা। অতএব সচরাচর পৃথিবীতে চারদিকে যে সকল ঠেলাঠেলি গোলমাল গালমন্দ চলতে থাকে তার থেকে আত্মরক্ষা করবার উপকরণ আমার ছিল।

কিন্তু আধুনিক কালের বড়মানুষরা স্বাভাবিক উৎপাতের চেয়ে বেশী, তারা অস্বাভাবিক উৎপাত। দু হাত দু পা এক মুণ্ড যাদের আছে তারা হল মানুষ; যাদের হঠাৎ কতকগুলো হাত পা মাথামুণ্ড বেড়ে গেচে তারা হল দৈত্য। অহরহ দুদ্দাড় শব্দে তারা আপনার সীমাকে ভাঙতে থাকে এবং আপন বাহুল্য দিয়ে স্বর্গ মর্ত্ত্যকে অতিষ্ঠ করে তোলে। তাদের প্রতি মনোযোগ না দেওয়া অসম্ভব। যাদের পরে মন দেবার কোনই প্রয়োজন নেই অথচ মন না দিয়ে থাকবারও জো নেই তারাই হচ্চে জগতের অস্বাস্থ্য, স্বয়ং ইন্দ্র পর্য্যন্ত তাদের ভয় করেন।

মনে বুঝলুম সিতাংশু মৌলি সেই দলের মানুষ। একা একজন লোক যে এত বেজায় অতিরিক্ত হতে পারে তা আমি পূর্ব্বে জানতুম না। গাড়ি ঘোড়া লোক লস্কর নিয়ে সে যেন দশ মুণ্ড বিশ হাতের পালা জমিয়েছে। কাজেই তার জ্বালায় আমার সারস্বত স্বর্গলোকটির বেড়া রোজ ভাঙতে লাগল।

তার সঙ্গে আমার প্রথম পরিচয় আমাদের গলির মোড়ে। এ গলিটার প্রধান গুণ ছিল এই যে, আমার মত আনমনা লোক সামনের দিকে না তাকিয়ে, পিঠের দিকে মন না দিয়ে, ডাইনে বাঁয়ে ভ্রূক্ষেপ-মাত্র না করেও এখানে নিরাপদে বিচরণ করতে পারে। এমন কি, এখানে সেই পথ-চল্‌তি অবস্থায় মেরেডিথের গল্প, ব্রাউনিঙের কাব্য অথবা আমাদের কোনো আধুনিক বাঙালী কবির রচনাসম্বন্ধে মনে মনে বিতর্ক করেও অপঘাত মৃত্যু বাঁচিয়ে চলা যায়। কিন্তু সেদিন থামকা একটা প্রচণ্ড "হেইয়ো" গর্জ্জন শুনে পিঠের দিকে তাকিয়ে দেখি একটা খোলা ক্রহাম গাড়ির প্রকাণ্ড একজোড়া লাল ঘোড়া আমার পিঠের উপর পড়ে আর কি! যাঁর গাড়ি তিনি স্বয়ং হাঁকাচ্চেন, পাশে তাঁর কোচমান বসে। বাবু সবলে দুই হাতে রাশ টেনে ধরেচেন। আমি কোনোমতে সেই সঙ্কীর্ণ গলির পার্শ্ববর্ত্তী একটা তামাকের দোকানের হাঁটু আঁকড়ে ধরে আত্মরক্ষা করলুম। দেখলুম আমার উপর বাবু ক্রুদ্ধ। কেননা যিনি অসতর্কভাবে রথ হাঁকান অসতর্ক পদাতিককে তিনি কোনোমতেই ক্ষমা করতে পারেন না। এর কারণটা পূর্ব্বেই উল্লেখ করেচি। পদাতিকের দুটিমাত্র পা, সে হচ্চে স্বাভাবিক মানুষ। আর যে-ব্যক্তি জুড়ি হাঁকিয়ে ছোটে তার আট পা; সে হল দৈত্য। তার এই অস্বাভাবিক বাহুল্যের দ্বারা জগতে সে উৎপাতের সৃষ্টি করে। দুই পা-ওয়ালা মানুষের বিধাতা এই আট পা-ওয়ালা আকস্মিকটার জন্যে প্রস্তুত ছিলেন না।

স্বভাবের স্বাস্থ্যকর নিয়মে এই অশ্বরথ ও সারথী সবাইকেই যথা সময়ে ভুলে যেতুম। কারণ এই পরমাশ্চর্য্য জগতে এরা বিশেষ করে মনে রাখবার জিনিস নয়। কিন্তু প্রত্যেক মানুষের যে পরিমাণ গোল-

মাল করবার স্বাভাবিক বরাদ্দ আছে এঁরা তার চেয়ে ঢের বেশী জবর দখল করে বসে আছেন। এইজন্যে যদিচ ইচ্ছা করলেই আমার তিন নম্বর প্রতিবেশীকে দিনের পর দিন মাসের পর মাস ভুলে থাকতে পারি কিন্তু আমার এই পয়লা নম্বরের প্রতিবেশীকে এক মুহূর্ত্ত আমার ভুলে থাকা শক্ত। রাত্রে তার আট দশটা ঘোড়া আস্তাবলের কাঠের মেঝের উপর বিনা সঙ্গীতের যে তাল দিতে থাকে তাতে আমার ঘুম সর্ব্বাঙ্গে টোল খেয়ে তুবড়ে যায়। তার উপর ভোর বেলায় সেই আট দশটা ঘোড়াকে আট দশটা সহিস যখন সশব্দে মল্‌তে থাকে তখন সৌজন্য রক্ষা করা অসম্ভব হয়ে দাঁড়ায়। তার পরে তাঁর উড়ে বেহারা, ভোজপুরী বেহারা, তাঁর পাঁড়ে তেওয়ারি দরোয়ানের দল কেউই স্বর সংযম কিম্বা মিত-ভাষিতার পক্ষপাতী নয়। তাই বলছিলুম, ব্যক্তিটি একটিমাত্র কিন্তু তার গোলমাল করবার যন্ত্র বিস্তর। এইটেই হচ্চে দৈত্যের লক্ষণ। সেটা তার নিজের পক্ষে অশান্তিকর না হতে পারে। নিজের কুড়িটা নাসারন্ধ্রে নাক ডাকবার সময় রাবণের হয়ত ঘুমের ব্যাঘাত হত না কিন্তু তার প্রতিবেশির কথাটা চিন্তা করে দেখো। স্বর্গের প্রধান লক্ষণ হচ্চে পরিমাণ-সুষমা, অপর পক্ষে একদা যে দানবের দ্বারা স্বর্গের নন্দন-শোভা নষ্ট হয়েছিল তাদের প্রধান লক্ষণ ছিল অপরিমিতি। আজ সেই অপরিমিতি দানবটাই টাকার থলিকে বাহন করে মানবের লোকালয়কে আক্রমণ করেচে। তাকে যদি বা পাশ কাটিয়ে এড়িয়ে যেতে চাই সে চার ঘোড়া হাঁকিয়ে ঘাড়ের উপর এসে পড়ে—এবং উপরন্তু চোখ রাঙায়।

সেদিন বিকেলে আমার বৈতগুলি তখনো কেউ আসে নি; আমি বসে বসে জোয়ার ভাঁটার তত্ত্ব সম্বন্ধে একখানা বই পড়ছিলুম এমন

সময়ে আমাদের বাড়ির প্রাচীর ডিঙিয়ে দরজা পেরিয়ে আমার প্রতিবেশির একটা স্মারক-লিপি ঝন্ ঝন্ শব্দে আমার শাসির উপর এসে পড়ল। সেটা একটি টেনিসের গোলা। চন্দ্রমার আকর্ষণ, পৃথিবীর নাড়ির চাঞ্চল্য, বিশ্বগীতি-কাব্যের চিরন্তন ছন্দতত্ত্ব প্রভৃতি সমস্তকে ছাড়িয়ে মনে পড়ল আমার একজন প্রতিবেশী আছেন, এবং অত্যন্ত বেশী করে আছেন; আমার পক্ষে তিনি সম্পূর্ণ অনাবশ্যক অথচ নিরতিশয় অবশ্যম্ভাবী। পরক্ষণেই দেখি আমার বুড়ো অযোধ্যা বেহারাটা দৌড়তে দৌড়তে হাঁপাতে হাঁপাতে এসে উপস্থিত। এই আমার একমাত্র অনুচর। এঁকে ডেকে পাইনে, হেঁকে বিচলিত করতে পারিনে—দুর্লভতার কারণ জিজ্ঞাসা করলে বলে, একা মানুষ কিন্তু কাজ বিস্তর। আজ দেখি বিনা তাগিদেই গোলা কুড়িয়ে সে পাশের বাড়ির দিকে ছুটচে। খবর পেলুম প্রত্যেকবার গোলা কুড়িয়ে দেবার জন্যে সে চার পয়সা করে মজুরি পায়।

দেখলুম কেবল যে আমার শাসি ভাঙচে, আমার শান্তি ভাঙচে তা নয়, আমার অনুচর পরিচরদের মন ভাঙতে লাগল। আমার অকিঞ্চিৎকরতা সম্বন্ধে অযোধ্যা বেহারার অবজ্ঞা প্রত্যহ বেড়ে উঠ্‌চে, সেটা তেমন আশ্চর্য্য নয় কিন্তু আমার দ্বৈত সম্প্রদায়ের প্রধান সর্দ্দার কানাই লালের মনটাও দেখচি পাশের বাড়ির প্রতি উৎসুক হয়ে উঠল। আমার উপর তার যে নিষ্ঠা ছিল সেটা উপকরণমূলক নয়, অন্তঃকরণ মূলক, এই জেনে আমি নিশ্চিন্ত ছিলুম এমন সময় একদিন লক্ষ্য করে দেখলুম সে আমার অযোধ্যাকে অতিক্রম করে টেনিসের পলাতক গোলাটা কুড়িয়ে নিয়ে পাশের বাড়ির দিকে ছুটচে। বুঝলুম এই উপলক্ষ্যে প্রতিবেশির সঙ্গে আলাপ করতে চায়। সন্দেহ হল ওর

মনের ভাবটা ঠিক ব্রহ্মবাদিনী মৈত্রেয়ীর মত নয়—শুধু অমৃতে ওর পেট ভরবে না।

আমি পয়লা নম্বরের বাবুগিরিকে খুব তীক্ষ্ণ বিদ্রূপ করবার চেষ্টা করতুম। বল্‌তুম সাজ সজ্জা দিয়ে মনের শূন্যতা ঢাকা দেওয়ার চেষ্টা ঠিক যেন রঙীন মেঘ দিয়ে আকাশ মুড়ি দেবার দুরাশা। একটু হাওয়াতেই মেঘ যায় সরে, আকাশের ফাঁকা বেরিয়ে পড়ে। কানাইলাল একদিন প্রতিবাদ করে বল্লে, "মানুষটা একেবারে নিছক ফাঁপা নয়, বি এ পাস করেচে।" কানাইলাল স্বয়ং বিএ পাস করা, এ জন্য ঐ ডিগ্রিটা সম্বন্ধে কিছু বল্‌তে পারলুম না।

পয়লা নম্বরের প্রধান গুণগুলি সশব্দ। তিনি তিনটে যন্ত্র বাজাতে পারেন, কর্ণেট, এসরাজ এবং চেলো। যখন-তখন তার পরিচয় পাই। সঙ্গীতের সুর সম্বন্ধে আমি নিজেকে সুরাচার্য্য বলে অভিমান করিনে। কিন্তু আমার মতে গানটা উচ্চ অঙ্গের বিদ্যা নয়। ভাষার অভাবে মানুষ যখন বোবা ছিল তখনই গানের উৎপত্তি,—তখন মানুষ চিন্তা করতে পারত না বলে চীৎকার করত। আজও যে সব মানুষ আদিম অবস্থায় আছে তারা শুধু শুধু শব্দ করতে ভালবাসে। কিন্তু দেখ্‌তে পেলুম আমার দ্বৈত দলের মধ্যে অন্তত চারজন ছেলে আছে, পয়লা নম্বরে চেলো বেজে উঠ্‌লেই যারা গাণিতিক ন্যায় শাস্ত্রের নব্যতম অধ্যায়েও মন দিতে পারে না।

আমার দলের মধ্যে অনেক ছেলে যখন পয়লা নম্বরের দিকে হেল্‌চে এমন সময়ে অনিলা একদিন আমাকে বল্‌লে, পাশের বাড়িতে একটা উৎপাত জুটেচে, এখন আমরা এখান থেকে অন্য কোনো বাসায় গেলেই ত ভাল হয়।

বড় খুসি হলুম। আমার দলের লোকদের বল্লুম, "দেখেচ মেয়েদের কেমন একটা সহজ বোধ আছে। তাই, যে সব জিনিস প্রমাণযোগে বোঝা যায় তা ওরা বুঝতেই পারে না কিন্তু যে সব জিনিসের কোনো প্রমাণ নেই তা বুঝতে ওদের একটুও দেরি হয় না।"

কানাইলাল হেসে বল্লে "যেমন পেঁচো, ব্রহ্মদৈত্য, ব্রাহ্মণের পায়ের ধূলোর মাহাত্ম্য, পতি দেবতা পূজার পুণ্যফল ইত্যাদি ইত্যাদি।"

আমি বল্লুম, "না হে, এই দেখ না আমরা এই পয়লা নম্বরের জাঁক জমক দেখে স্তম্ভিত হয়ে গেচি কিন্তু অনিলা ওর সাজসজ্জায় ভোলে নি।"

অনিলা দু'তিনবার বাড়ী বদলের কথা বল্লে। আমার ইচ্ছাও ছিল কিন্তু কলকাতার গলিতে গলিতে বাসা খুঁজে বেড়াবার মত অধ্যবসায় আমার ছিল না। অবশেষে একদিন বিকেল বেলায় দেখা গেল কানাই-লাল এবং সতীশ পয়লা নম্বরে টেনিস্ খেলুচে। তার পরে জনশ্রুতি শোনা গেল যতী আর হরেন পয়লা নম্বরে সঙ্গীতের মজলিশে একজন বক্স হার্ম্মোনিয়ম বাজায় এবং একজন বাঁয়া তবলায় সঙ্গত করে, আর অরুণ নাকি সেখানে কমিক গান করে' খুব প্রতিপত্তি লাভ করেচে। এদের আমি পাঁচ ছ' বছর ধরে জানি কিন্তু এদের যে এ সব গুণ ছিল তা আমি সন্দেহও করি নি। বিশেষতঃ আমি জানতুম অরুণের প্রধান সখের বিষয় হচ্চে তুলনামূলক ধর্ম্মতত্ত্ব, সে যে কমিক গানে ওস্তাদ তা কি করে বুঝব?

সত্য কথা বলি আমি এই পয়লা নম্বরকে মুখে যতই অবজ্ঞা করি মনে মনে ঈর্ষা করেছিলুম। আমি চিন্তা করতে পারি, বিচার করতে পারি, সকল জিনিসের সার গ্রহণ করতে পারি, বড় বড় সমস্যার

সামাধান করতে পারি—মানসিক সম্পদে সিতাংশু মৌলিকে আমার সমকক্ষ বলে কল্পনা করা অসম্ভব। কিন্তু তবু ঐ মানুষটিকে আমি ঈর্ষা করেচি। কেন সে কথা যদি খুলে বলি ত লোকে হাসবে। সকাল বেলায় সিতাংশু একটা দুরন্ত ঘোড়ায় চড়ে বেড়াতে বেরত—কি আশ্চর্য্য নৈপুণ্যের সঙ্গে রাশ বাগিয়ে এই জন্তুটাকে সে সংযত করত। এই দৃশ্যটি রোজই আমি দেখতুম আর ভাবতুম, আহা আমি যদি এই রকম অনায়াসে ঘোড়া হাঁকিয়ে যেতে পারতুম! পটুত্ব বলে যে জিনিসটি আমার একেবারেই নেই সেইটের পরে আমার ভারি একটা গোপন লোভ ছিল। আমি গানের সুর ভালো বুঝিনে কিন্তু জানলা থেকে কতদিন গোপনে দেখেচি সিতাংশু এস্‌রাজ বাজাচ্চে। ঐ যন্ত্রটার পরে তার একটি বাধাহীন সৌন্দর্য্যময় প্রভাব আমার কাছে আশ্চর্য্য মনোহর বোধ হত। আমার মনে হত যন্ত্রটা যেন প্রেয়সী নারীর মত ওকে ভালবাসে—সে আপনার সমস্ত সুর ওকে ইচ্ছা করে বিকিয়ে দিয়েচে। জিনস-পত্র বাড়ি ঘর জন্তু মানুষ সকলের পরেই সিতাংশুর এই সহজ প্রভাব ভারি একটি শ্রী বিস্তার করত। এই জিনিসটি অনির্ব্বচনীয়, আমি এ'কে নিতান্ত দুর্লভ না মনে করে থাকতে পারতুম না। আমি মনে করতুম পৃথিবীতে কোনো কিছু প্রার্থনা করা এ লোকটির পক্ষে অনাবশ্যক, সবই আপনিই এর কাছে এসে পড়বে, এ ইচ্ছা করে যেখানে গিয়ে বসবে সেই খানেই এর আসন পাতা।

তাই যখন একে একে আমার দ্বৈতগুলির অনেকেই পয়লা নম্বরে টেনিস খেল্‌তে কন্সর্ট বাজাতে লাগ্‌ল তখন স্থানত্যাগের দ্বারা এই লুব্ধদের উদ্ধার করা ছাড়া আর কোনো উপায় খুঁজে পেলুম না। দালাল এসে খবর দিলে মনের মত অন্য বাসা বরানগর কাশিপুরের

কাছাকাছি এক জায়গায় পাওয়া যাবে। আমি তাতে রাজি। সকাল তখন সাড়ে নটা। স্ত্রীকে প্রস্তুত হতে বল্‌তে গেলুম। তাঁকে ভাঁড়ার ঘরেও পেলুম না, রান্না ঘরেও না। দেখি শোবার ঘরে জানলার গরাদের উপর মাথা রেখে চুপ করে বসে আছেন। আমাকে দেখেই উঠে পড়লেন। আমি বল্লুম, "পর্শুই নতুন বাসায় যাওয়া যাবে।"

তিনি বল্লেন "আর দিন পনেরো সবুর কর।"

জিজ্ঞাসা করলুম, "কেন?"

অনিলা বল্লেন "সরোজের পরীক্ষার ফল শীঘ্র বেরবে—তার জন্য মনটা উদ্বিগ্ন আ'ছে, এ কয়দিন আর নড়াচড়া করতে ভাল লাগচে না।"

অন্যান্য অসংখ্য বিষয়ের মধ্যে এই একটি বিষয় আছে যা নিয়ে আমার স্ত্রীর সঙ্গে আমি কখনো আলোচনা করি নে। সুতরাং আপাতত কিছু দিন বাড়ি বদল মুলতবি রইল। ইতিমধ্যে খবর পেলুম সিতাংশু শীঘ্রই দক্ষিণ ভারতে বেড়াতে বেরবে সুতরাং দুই নম্বরের উপর থেকে মস্ত ছায়াটা সরে যাবে।

অদৃষ্ট নাট্যের পঞ্চমাঙ্কের শেষ দিকটা হঠাৎ দৃষ্ট হয়ে ওঠে। কাল আমার স্ত্রী তাঁর বাপের বাড়ী গিয়েছিলেন আজ ফিরে এসে তাঁর ঘরে দরজা বন্ধ করলেন। তিনি জানেন আজ রাত্রে আমাদের দ্বৈত দলের পূর্ণিমার ভোজ। তাই নিয়ে তাঁর সঙ্গে পরামর্শ করবার অভিপ্রায়ে দরজায় ঘা দিলুম। প্রথমে সাড়া পাওয়া গেল না। ডাক দিলুম, "অনু!" খানিক বাদে অনিলা এসে দরজা খুলে দিলে।

আমি জিজ্ঞাসা করলুম "আজ রাত্রে রান্নার জোগাড় সব ঠিক আছে ত?" সে কোন জবাব না দিয়ে মাথা হেলিয়ে জানালে যে আছে।

আমি বল্লুম, "তোমার হাতের তৈরি মাছের কচুরি আর বিলাতি আমড়ার চাটনি ওদের খুব ভাল লাগে, সেটা ভুলো না।" এই বলে বাইরে এসেই দেখি কানাইলাল বসে আছে।

আমি বল্লুম, "কানাই, আজ তোমরা একটু সকাল সকাল এসো।"

কানাই আশ্চর্য্য হয়ে বল্লে, "সে কি কথা? আজ আমাদের সভা হবে না কি?"

আমি বল্লুম, "হবে বৈ কি। সমস্ত তৈরি আছে—ম্যাক্সিম গর্কির নতুন গল্পের বই, বের্গসঁর উপর রাসেলের সমালোচনা, মাছের কচুরি, এমন কি আমড়ার চাটনি পর্য্যন্ত।"

কানাই অবাক হয়ে আমার মুখের দিকে চেয়ে রইল। খানিক বাদে বল্লে, "অদ্বৈত বাবু, আমি বলি আজ থাক্।"

অবশেষে প্রশ্ন করে জান্‌তে পারলুম, আমার শ্যালক সরোজ কাল বিকেল বেলায় আত্মহত্যা করে মরেচে। পরীক্ষায় সে পাশ হতে পারে নি তাই নিয়ে বিমাতার কাছ থেকে খুব গঞ্জনা পেয়েছিল—সইতে না পেরে গলায়চাদর বেঁধে মরেচে।

আমি জিজ্ঞাসা করলুম, "তুমি কোথা থেকে শুন্‌লে?"

সে বল্লে, "পয়লা নম্বর থেকে।"

পয়লা নম্বর থেকে!—বিবরণটা এই:—সন্ধ্যার দিকে অনিলার কাছে যখন খবর এল তখন সে গাড়ি ডাকার অপেক্ষা না করে অযোধ্যাকে সঙ্গে নিয়ে পথের মধ্যে থেকে গাড়ি ভাড়া করে বাপের বাড়িতে গিয়েছিল। অযোধ্যার কাছ থেকে রাত্রে সিতাংশু মৌলি এই খবর পেয়েই তখনি সেখানে গিয়ে পুলিসকে ঠাণ্ডা করে নিজে শ্মশানে উপস্থিত থেকে মৃতদেহের সৎকার করিয়ে দেন।

ব্যতিব্যস্ত হয়ে তখনি অন্তঃপুরে গেলুম। মনে করেছিলুম অনিলা বুঝি দরজা বন্ধ করে আবার তার শোবার ঘরের আশ্রয় নিয়েচে। কিন্তু এবারে গিয়ে দেখি ভাঁড়ারের সামনের বারান্দায় বসে সে আমড়ার চাটনির আয়োজন করেচে। যখন লক্ষ্য করে তার মুখ দেখলুম তখন বুঝলুম একরাত্রে তার জীবনটা উলট পালট হয়ে গেচে।

আমি অভিযোগ করে বল্লুম, "আমাকে কিছু বল নি কেন?"

সে তার বড় বড় দুই চোখ তুলে একবার আমার মুখের দিকে তাকালে, কোনো কথা কইলে না। আমি লজ্জায় অত্যন্ত ছোট হয়ে গেলুম। যদি অনিলা বল্‌ত, "তোমাকে বলে লাভ কি?" তাহলে আমার জবাব দেবার কিছুই থাক্‌ত না। জীবনের এই সব বিপ্লব, সংসারের সুখ দুঃখ নিয়ে কি করে যে ব্যবহার করতে হয় আমি কি তার কিছুই জানি?

আমি বল্লুম, "অনিল, এ সব রাখ, আজ আমাদের সভা হবে না।"

অনিলা আমড়ার খোসা ছাড়াবার দিকে দৃষ্টি রেখে বল্লে, "কেন হবে না, খুব হবে। আমি এত করে সমস্ত আয়োজন করেচি সে আমি নষ্ট হতে দিতে পারব না।"

আমি বল্লুম, "আজ আমাদের সভার কাজ হওয়া অসম্ভব।"

সে বল্লে, "তোমাদের সভা না হয় না হবে আজ আমার নিমন্ত্রণ।"

আমি মনে একটু আরাম পেলুম। ভাবলুম অনিলের শোকটা তত বেশি কিছু নয়। মনে করলুম, সেই যে এক সময়ে ওর সঙ্গে বড় বড় বিষয়ে কথা কইতুম তারই ফলে ওর মনটা অনেকটা নিরাসক্ত হয়ে এসেচে। যদিচ সব কথা বোঝবার মত শিক্ষা এবং শক্তি ওর ছিল না, কিন্তু তবু পার্সোনাল্ ম্যাগ্নেটিজ্‌ম্ বলে একটা জিনিস আছে ত।

সন্ধ্যার সময় আমার বৈষ্ণব দলের দুই চার জন কম পড়ে গেল। কানাইত এলই না। পয়লা নম্বরে যারা টেনিসের দলে যোগ দিয়েছিল তারাও কেউ আসে নি। শুনলুম, কাল ভোরের গাড়িতে সিতাংশু-মৌলি চলে যাচ্চে তাই এরা সেখানে বিদায় ভোজ খেতে গেছে। এ দিকে অনিলা আজ যে রকম ভোজের আয়োজন করেছিল এমন আর কোনো দিনই করে নি। এমন কি, আমার মত বেহিসাবী লোকেও এ কথা না মনে করে থাক্‌তে পারে নি যে, খরচটা অতিরিক্ত করা হয়েচে।

সে দিন খাওয়া দাওয়া করে সভাভঙ্গ হতে রাত্রি একটা দেড়টা হয়ে গেল। আমি ক্লান্ত হয়ে তখনি শুতে গেলুম। অনিলাকে জিজ্ঞাসা করলুম "শোবে না?" সে বল্লে, "বাসন গুলো তুল্‌তে হবে।"

পরের দিন যখন উঠলুম তখন বেলা প্রায় আটটা হবে। শোবার ঘরে টিপাইয়ের উপর যেখানে আমার চষমাটা খুলে রাখি সেখানে দেখি আমার চষমা চাপা দেওয়া একটুক্‌রো কাগজ, তাতে অনিলের হাতের লেখাটি আছে—"আমি চল্লুম। আমাকে খুঁজতে চেষ্টা কোরো না। করলেও খুঁজে পাবে না।"

কিছু বুঝতে পারলুম না। টিপাইয়ের উপরে একটা টিনের বাক্স—সেটা খুলে দেখি, তার মধ্যে অনিলার সমস্ত গয়না—এমন কি তার হাতের চুড়ি বালা পর্য্যন্ত, কেবল তার শাঁখা এবং হাতের লোহা ছাড়া। একটা খোপের মধ্যে চাবির গোচ্ছা, অন্য অন্য খোপে কাগজের মোড়কে করা কিছু টাকা সিকি দুয়ানি। অর্থাৎ মাসের খরচ বাঁচিয়ে অনিলের হাতে যা কিছু জমে ছিল তার শেষ পয়সাটি পর্য্যন্ত রেখে গেছে। একটি খাতায় বাসন কোসন জিনিস পত্রের ফর্দ্দ, এবং ধোবার বাড়িতে যে সব কাপড় গেছে তার সব

হিসাব। এই সঙ্গে গয়লা বাড়ির এবং মুদির দোকানের দেনার হিসাবও টোঁকা আছে, কেবল তার নিজের ঠিকানা নেই।

এই টুকু বুঝতে পারলুম অনিল চলে গেছে। সমস্ত ঘর তন্ন তন্ন করে দেখ্‌লুম—আমার শ্বশুর বাড়িতে খোঁজ নিলুম কোথাও সে নেই। কোনো একটা বিশেষ ঘটনা ঘট্‌লে সে সম্বন্ধে কি রকম বিশেষ ব্যবস্থা করতে হয় কোনদিন আমি তার কিছুই ভেবে পাই নে। বুকের ভিতরটা হা হা করতে লাগ্‌ল। হঠাৎ পয়লা নম্বরের দিকে তাকিয়ে দেখি সে বাড়ির দরজা জানলা বন্ধ। দেউড়ির কাছে দরোয়ানজি গড়গড়ায় তামাক টানচে। রাজাবাবু ভোর রাত্রে চলে গেছেন। মনটার মধ্যে ছ্যাঁক করে উঠ্‌ল। হঠাৎ বুঝতে পারলুম, আমি যখন একমনে নব্যতম ন্যায়ের আলোচনা করছিলুম তখন মানবসমাজের পুরাতনতম একটি অন্যায় আমার ঘরে জাল বিস্তার করছিল। ফ্লোবেয়ার, টলষ্টয়, টুর্গেনীভ প্রভৃতি বড় বড় গল্প-লিখিয়েদের বইয়ে যখন এই রকমের ঘটনার কথা পড়েচি তখন বড় আনন্দে সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম করে তার তত্ত্ব কথা বিশ্লেষণ করে দেখেচি। কিন্তু নিজের ঘরেই যে এটা এমন সুনিশ্চিত করে ঘট্‌তে পারে তা কোনো দিন স্বপ্নেও কল্পনা করি নি।

প্রথম ধাক্কাটাকে সাম্‌লে নিয়ে আমি প্রবীন তত্ত্বজ্ঞানীর মত সমস্ত ব্যাপারটাকে যথোচিত হাল্‌কা করে দেখবার চেষ্টা করলুম। যে দিন আমার বিবাহ হয়েছিল সেই দিনকার কথাটা মনে করে শুষ্ক হাসি হাস্‌লুম। মনে করলুম মানুষ কত আকাঙ্ক্ষা কত আয়োজন কত আবেগের অপব্যয় করে থাকে। কতদিন কত রাত্রি কত বৎসর নিশ্চিন্ত মনে কেটে গেল ; স্ত্রী বলে একটা সজীব পদার্থ নিশ্চয় আছে বলে চোখ বুজে ছিলুম এমন সময় আজ হঠাৎ চোখ খুলে দেখি বুদ্বুদ

ফেটে গিয়েচে। গেছে যাক্‌গে—কিন্তু জগতে সবই ত বুদ্বুদ নয়। যুগযুগান্তরের জন্মমৃত্যুকে অতিক্রম করে টিঁকে রয়েচে এমন সব জিনিসকে আমি কি চিন্‌তে শিখি নি ?

কিন্তু দেখলুম হঠাৎ এই আঘাতে আমার মধ্যে নব্য কালের জ্ঞানীটা মূর্চ্ছিত হয়ে পড়ল, আর কোন আদিকালের প্রাণীটা জেগে উঠে ক্ষুধায় কেঁদে বেড়াতে লাগল। বারান্দার ছাতে পায়চারি করতে করতে শূন্য বাড়িতে ঘুরতে ঘুরতে শেষকালে, যেখানে জানালার কাছে কতদিন আমার স্ত্রীকে একলা চুপ করে বসে থাক্‌তে দেখেচি, একদিন আমার সেই শোবার ঘরে গিয়ে পাগলের মত সমস্ত জিনিস পত্র ঘাঁটতে লাগ্‌লুম। অনিলের চুল বাঁধবার আয়নার দেরাজটা হঠাৎ টেনে খুল্‌তেই রেশমের লাল ফিতেয় বাঁধা একতাড়া চিঠি বেরিয়ে পড়ল। চিঠিগুলি পয়লা নম্বর থেকে এসেচে। বুকটা জ্বলে উঠল। একবার মনে হল সবগুলো পুড়িয়ে ফেলি। কিন্তু যেখানে বড় বেদনা সেই খানেই ভয়ঙ্কর টান। এ চিঠিগুলো সমস্ত না পড়ে আমার থাকবার জো নেই।

এই চিঠিগুলি পঞ্চাশবার পড়েছি। প্রথম চিঠিখানা তিন,চার টুক্‌রো করে ছেঁড়া। মনে হল পাঠিকা পড়েই সেটি ছিঁড়ে ফেলে তার পরে আবার যত্ন করে একখানা কাগজের উপরে গঁদ দিয়ে জুড়ে রেখেচে। সে চিঠিখানা এই ঃ—

"আমার এ চিঠি না পড়েই যদি তুমি ছিঁড়ে ফেল তবু আমার দুঃখ নেই। আমার যা বলবার কথা তা আমাকে বল্‌তেই হবে।

আমি তোমাকে দেখেচি। এতদিন এই পৃথিবীতে চোখ মেলে বেড়াচ্চি কিন্তু দেখবার মত দেখা আমার জীবনে এই বত্রিশ বছর বয়সে

প্রথম ঘটল। চোখের উপরে ঘুমের পর্দ্দা টানা ছিল; তুমি সোনার কাঠি ছুঁইয়ে দিয়েচ—আজ আমি নব জাগরণের ভিতর দিয়ে তোমাকে দেখলুম—যে-তুমি স্বয়ং তোমার সৃষ্টিকর্ত্তার পরম বিস্ময়ের ধন সেই অনির্ব্বচনীয় তোমাকে। আমার যা পাবার তা পেয়েচি, আর কিছু চাই নে, কেবল তোমার স্তব তোমাকে শোনাতে চাই। যদি আমি কবি হতুম তা হলে আমার এই স্তব চিঠিতে তোমাকে লেখবার দরকার হত না, ছন্দের ভিতর দিয়ে সমস্ত জগতের কণ্ঠে তাকে প্রতিষ্ঠিত করে যেতুম। আমার এ চিঠির কোনো উত্তর দেবেনা জানি—কিন্তু আমাকে ভুল বুঝো না। আমি তোমার কোনো ক্ষতি করতে পারি এমন সন্দেহমাত্র মনে না রেখে আমার পূজা নীরবে গ্রহণ কোরো। আমার এই শ্রদ্ধাকে যদি তুমি শ্রদ্ধা করতে পার তাতে তোমারও ভাল হবে। আমি কে সে-কথা লেখবার দরকার নেই কিন্তু নিশ্চয়ই তা তোমার মনের কাছে গোপনে থাকবে না।"

এমন পঁচিশ খানি চিঠি। এর কোনো চিঠির উত্তর যে অনিলের কাছ থেকে গিয়েছিল এ চিঠিগুলির মধ্যে তার কোন নিদর্শন নেই। যদি যেত তা হলে তখনি বেসুর বেজে উঠ্‌ত;—কিম্বা তাহলে সোনার কাঠির জাদু একেবারে ভেঙে স্তব গান নীরব হত।

কিন্তু এ কি আশ্চর্য্য! সিতাংশু যাকে ক্ষণকালের ফাঁক দিয়ে দেখেচে আজ আট বছরের ঘনিষ্ঠতার পর এই পরের চিঠিগুলির ভিতর দিয়ে তাকে প্রথম দেখ্‌লুম। আমার চোখের উপরকার ঘুমের পর্দ্দা কত মোটা পর্দ্দা না জানি। পুরোহিতের হাত থেকে অনিলাকে আমি পেয়েছিলুম কিন্তু তার বিধাতার হাত থেকে তাকে গ্রহণ করবার মূল্য আমি কিছুই দিই নি। আমি আমার দ্বৈতদলকে এবং নব্য ন্যায়কে

তার চেয়ে অনেক বড় করে দেখেচি। সুতরাং যাকে আমি কোন দিনই দেখি নি, এক নিমেষের জন্যও পাই নি, তাকে আর-কেউ যদি আপনার জীবন উৎসর্গ করে পেয়ে থাকে তবে কি-বলে কার কাছে আমার ক্ষতির নালিশ করব?

শেষ চিঠি খানা এই:—

"বাইরে থেকে আমি তোমার কিছুই জানি নে কিন্তু অন্তরের দিক থেকে আমি দেখেচি তোমার বেদনা। এই খানে বড় কঠিন আমার পরীক্ষা। আমার এই পুরুষের বাহু নিশ্চেষ্ট থাকতে চায় না। ইচ্ছা করে স্বর্গমর্ত্তের সমস্ত শাসন বিদীর্ণ করে তোমাকে তোমার জীবনের ব্যর্থতা থেকে উদ্ধার করে আনি। তার পরে এও মনে হয় তোমার দুঃখই তোমার অন্তর্য্যামীর আসন। সেটি হরণ করবার অধিকার আমার নেই। কাল ভোর বেলা পর্য্যন্ত মেয়াদ নিয়েচি। এর মধ্যে যদি কোন দৈববাণী আমার এই দ্বিধা মিটিয়ে দেয় তাহলে যা হয় একটা কিছু হবে। বাসনার প্রবল হাওয়ায় আমাদের পথ চলবার প্রদীপকে নিবিয়ে দেয়। তাই আমি মনকে শান্ত রাখব—এক মনে এই মন্ত্র জপ করব যে, তোমার কল্যাণ হোক্।"

বোঝা যাচ্চে দ্বিধা দূর হয়ে গেছে—দুজনার পথ এক হয়ে মিলেচে। মাঝের থেকে সিতাংশুর লেখা এই চিঠিগুলি আমারই চিঠি হয়ে উঠল—ওগুলি আজ আমারই প্রাণের স্তবমন্ত্র।

কতকাল চলে গেল, বই পড়তে আর ভাল লাগে না। অনিলকে একবার কোন মতে দেখবার জন্যে মনের মধ্যে এমন বেদনা উপস্থিত হল কিছুতেই স্থির থাকতে পারলুম না। খবর নিয়ে জানলুম সিতাংশু তখন মসুরি পাহাড়ে।

সেখানে গিয়ে সিতাংশুকে অনেকবার পথে বেড়াতে দেখেছি কিন্তু তার সঙ্গে ত অনিলকে দেখি নি। ভয় হল পাছে তাকে অপমান করে ত্যাগ করে থাকে। আমি থাকতে না পেরে একেবারে তার সঙ্গে গিয়ে দেখা করলুম। সব কথা বিস্তারিত করে লেখবার দরকার নেই। সিতাংশু "বল্লে আমি তাঁর কাছ থেকে জীবনে কেবল একটি-মাত্র চিঠি পেয়েচি—সেটি এই দেখুন।"

এই বলে সিতাংশু তার পকেট থেকে একটি ছোট এনামেল করা সোনার কার্ড কেস্ খুলে তার ভিতর থেকে এক টুক্‌রো কাগজ বের করে দিলে। তাতে লেখা আছে, "আমি চল্লুম, আমাকে খুঁজতে চেষ্টা কোরো না। কর্‌লেও খোঁজ পাবে না।"

সেই অক্ষর, সেই লেখা, সেই তারিখ। এবং যে নীল রঙের চিঠির কাগজের অর্দ্ধেকখানা আমার কাছে, এই টুক্‌রোটি তারি বাকি অর্দ্ধেক।

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

কৌতুকময়ী।

—:০:—

সে এক তরুণী বালা দিবস নিশায়
বাহি লয়ে চলে' যায় তরণী আমার,
সে যে মোরে দিবানিশি কাঁদায় হাসায়,
তাহার এ পারাবারে নাহি পারাপার;—
সে মোরে বাহিয়া নেয় দিগন্তের পানে।
যবে মেঘলুপ্তাকাশে বিদারে অশনি
আমি শুধু ভয়ে মরি, সে যে হাসি গানে
আমারে কৌতুক হানে কৌতুক-চাহনি।
সান্দ্র শুভ্র জ্যোৎস্না তল ভরি অশ্রুজলে
কাঙাল নয়ন তার চায় মোর পানে;
ব্যথায় গুঞ্জন ওঠে হৃদয় কমলে,
বৃথা সদা খুঁজি তারে জীবনের গানে,—
সে এক রহস্যময়ী সে এক তরুণী
সদা বাহি লয়ে চলে আমার তরণী।

শ্রীসুরেশ চন্দ্র চক্রবর্ত্তী।